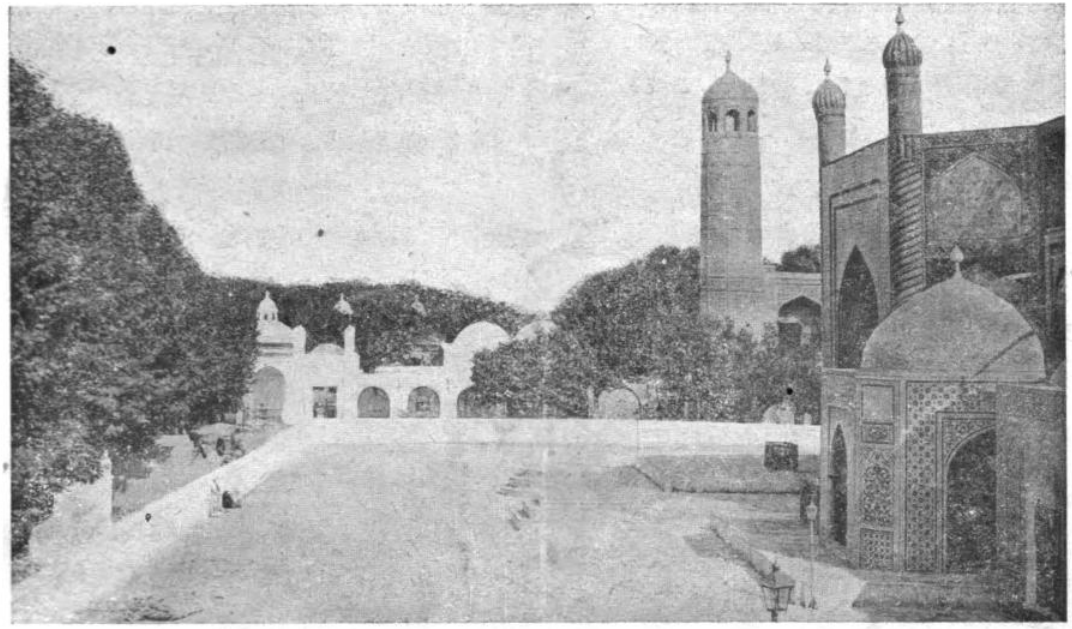

কান্দাহার

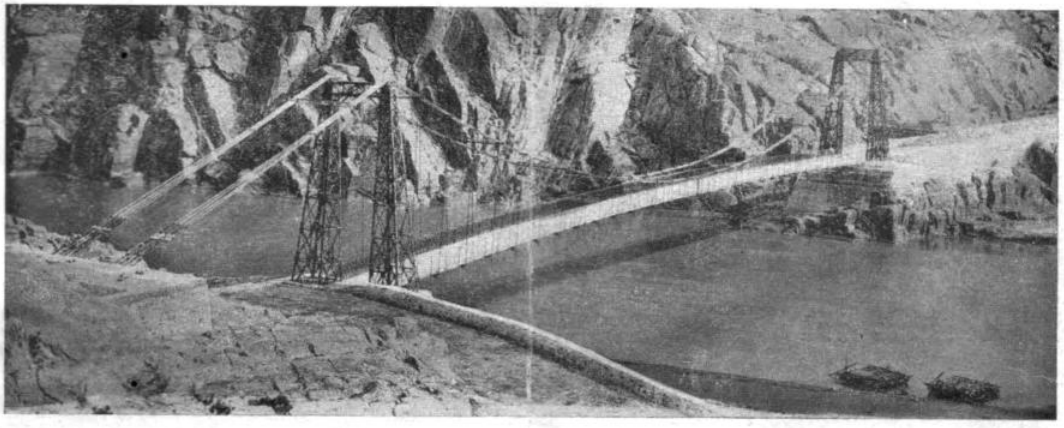

জেলালাবাদের পথে

কান্দাহার

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান - দেবাশিষ রায়

এডিট - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার কোন স্পেসাল ইস্যু থাকে এবং আপনি সেটা যদি স্ক্যান করে দিয়ে আমাদের প্রজেক্টকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

১৩০২ সনে প্রবর্ত্তিত

"ছোট প্রাণে আমাদের দাও ভালবাসা,
ছোট ছোট মুখে দাও স্বরগের ভাষা"

নব পর্য্যায় | ফাল্গুন ১৩৪৮ | [১১শ সংখ্যা

বসন্তাগমনে

শ্রীনিবারণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বসন্ত এলো নীল আকাশে
দখিনা সুমধুর বাতাসে,
সবুজ শাখে শাখে, বিহগ ঝাঁকে ঝাঁকে
গাহে গান নবীন হরষে
বসন্ত এলো নীল আকাশে!

বসন্ত এলো আজ কাননে
শ্যামল মনোহর ভূষণে,
কোরকে কুলদল, হাসিছে খল খল,
নাচিছে ধীরি ধীরি পবনে,
সবুজ শোভাময় কাননে।

কুসুমেরা নাচে আজি ছন্দে
উপবন মাতোয়ারা গন্ধে,
সমীর শিহরণ ঝিঁঝিঁর গুণ্‌জন,
উল্লাসে ঋতুরাজে বন্দে
আজি যেন কী নবীন ছন্দে

বসন্ত এলো নীল গগনে
আজি কি শুভ এক লগনে,
জ্যোৎস্না মেখে গায়, হাসিছে বনছায়,
হাস্‌নাহানা নাচে পবনে
নন্দন এলো কি গো ভুবনে!

এসেছে ঋতুরাজ এসেছে,
আগমনী সঙ্গীত উঠেছে,
নূপুর ধ্বনি তার, কোকিলের ঝঙ্কার
ধরণীর কানে কানে কহিছে
এসেছে মধুমাস এসেছে।

শিশির নাহি আজ ভুবনে
কুয়াশা নাহি আর গগনে,
নবীন সাড়া পেয়ে ধরণী দেখে চেয়ে,
অতিথি আসিয়াছে ভবনে.
নন্দন নামিয়াছে ভুবনে।

স্মৃতিকথা

রায় বাহাদুর প্রমদারঞ্জন রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গয়মপাণি হইতে গোলাঘাট ১৪ মাইল পথ তাহাতে আবার গরমের দিন, কাজেই ভোরে ৪।৪॥টার সময় সকলকে উঠিতে হইবে। ৪টার পূর্ব্বেই গোলমাল আর লোকের চেঁচামেচিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দেখি এক জায়গায় ৪।৫জন সার্ভেয়ার, হাতীর মাহুত আর অনেক খালাসী জড় হইয়া গোলমাল করিতেছে। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,"কি হয়েছে ? ইন্দ্রসিং আর একজন বুড়া সার্ভেয়ার ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "হুজুর, বক্তাওয়ার সিং এর টাকা সব পাওয়া গিয়েছে।"

"কি করে পাওয়া গেল ?"

"দেওয়ানজীর (ঐ বুড়া সার্ভেয়ারকে সকলে দেওয়ানজী বলিয়া ডাকিত) চাকর তাঁর বিছানা বাঁধবার জন্য খাটিয়া ধরে টেনেছিল, পাশে হাতীর ভীমগর্দ্দ ছিল তাহাতে খাটিয়ার ধাক্কা লেগেছিল আর অমনি ঝণাৎ করে গদীর উপর হতে কয়েকটা টাকা নীচে পড়িয়া গেল। আওয়াজ শুনে দেওয়ানজী দেখতে গেলেন ব্যাপার কি ? গিয়ে দেখলেন কয়েকটা টাকা মাটিতে পড়ে রয়েছে, আর গদির উপর সার সার অনেক টাকা সাজান রয়েছে। গুনে ৮৭৲ টাকা সব পাওয়া গেছে।"

আমি চাপরাশীকে ডাকিয়া বলিলাম,"তোমাকে গোলাঘাট যেতে হবে না। চিঠি দুটা ছিঁড়ে ফেল।"

চিঠি ছিঁড়িতে গিয়া দেখা গেল তাহাতে কিছুই লেখা নাই, শুধু হিজিবিজি আঁকা।

আসামের লাম্বর রিজার্ভ ফরেষ্টএ কায করিতে গিয়েছিলাম। ১৩৪৬ সনের আষাঢ় আর শ্রাবনের মুকুলে সেখানকার অভিজ্ঞতা কিছু কিছু তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম, এতদিন পর আরও যৎকিঞ্চিৎ উপহার দিতেছি। আশা করি তোমাদের ভাল লাগিবে।

ইন্দ্র সিংএর কাজে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা তোমরা শুনিয়াছ। পরের দিন সকাল বেলা আমরা ঐ রাস্তায়ই বাকি কাজটুকু শেষ করিতে গিয়াছিলাম। যাইবার সময় আগের রাত্রের সেই জানোয়ারটা কত বড় ছিল তাহা দেখিতে গেলাম ! যে জায়গায় জল খাইয়াছিল, আর যে জায়গায় হামা দিয়া বসিয়া ঐ লোক দুটিকে

পাহারা দিয়াছিল উভয় স্থলেই পায়ের দাগ দেখিলাম—আঙ্গুলশুদ্ধ আমার পাঞ্জার সমান এক একটা পায়ের দাগ! বেশ বড় বাঘ ছিল!

দুইদিন ঐ জায়গায় ছিলাম তাহার পর ফিরিবার পালা। পথ ঐ নদী নদী যে জায়গায় প্রথম দিন হাতী বাহির হইয়াছিল সেই পর্য্যন্ত, তাহার পর সার্ভেয়ারের কাটা লাইন ধরিয়া রিজার্ভ ফরেষ্টের সীমানা পর্য্যন্ত সীমানার উপর ১২ ফুট চওড়া লাইন কাটা, ঐ লাইন ধরিয়া নীচু—গারদ হইয়া ডিমাপুর যাইব। নীচু—গারদ হইতে ডিমাপুর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা।

একটু ভোরে বাহির হইয়াছি যদি কোনও শীকার মিলে। আমার সঙ্গে 'ফুদনা' নামে এক জন খালাসী। 'ফুদনা' সাঁওতাল, বেশ হুসিয়ার লোক, আর জঙ্গলে তাহার দৃষ্টিশক্তি খুব সাফ। কতবার দেখিয়াছিল ঝোঁপের মধ্যে হরিণ বা শূয়োর নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে আমার চোখে পড়িল না কিন্তু 'ফুদনা' ঠিক ধরিয়াছে। সে তাহার দেশে—হাজারিবাগের জঙ্গলে, শীকার করিয়া থাকে, এ কাজে সে অভ্যস্ত সুতরাং জানোয়ার সহজে তাহার চক্ষে ধুলা দিতে পারে না। তাহার সাহসও আছে যথেষ্ট, অনেকবার তাহার প্রমাণও পাইয়াছি।

নদী নদী চলিয়াছি, যে জায়গায় প্রথম দিন বাঘ পাইয়াছিলাম, সেই জায়গাটা পার হইয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ চলিয়া গিয়াছি। একটু একটু রোদ উঠিয়াছে, এক একবার দাঁড়াইয়া চারিদিক লক্ষ্য করে আবার পথ চলি। সম্মুখে বালির উপর একটা গাছের ডাল পড়িয়া রহিয়াছে; শুকনা ডাল হলদে রংএর শুকনা পাতা তাহার, ৪।৫ ফুট দূরেই জঙ্গল। দুই চারিবার এদিক-ওদিক দেখিয়া আবার ঐ শুকনা পাতা-কটির উপর চোখ গেল, ওটা যেন একটু নড়িল। ওরে বাবা! ওটা যে বাঘের বাচ্চা। আমাদের দিকে তাহার পিঠ, কুণ্ডলি পাকাইয়া শুইয়া রোদ পোহাইতেছে। আমরা দাঁড়াইলাম, বন্দুকটা ফুদনার ঘাড়ে, পিছন দিকে হাত বাড়াইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলাম, "বন্দুক"। ঐ যে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিয়াছি ঐটি তাহার কানে গিয়াছে। বাচ্চাটা তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া এক নজর আমাদিগকে দেখিয়া লইল আর সঙ্গে সঙ্গেই লাফাইয়া জঙ্গলে পড়িল। "মারো" "মারো" বলিয়া ফুদনা বন্দুক আমার হাতে দিল বটে কিন্তু মারিবার অবকাশ আর হইল না। বন্দুক হাতে করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম, দুই এক পা ফেলি আর দুই জনে বিশেষ মনোযোগ দিয়া একটি একটি করিয়া পাতা পরীক্ষা করিয়া দেখি কোথাও তাহার 'মা' বসিয়া আছে কিনা। কিছুই দেখিতে পাইলাম না। জানোয়ার দেখিতে পাইলাম না বটে কিন্তু ৫।৬ কদম চলিয়াই তাহার পায়ের দাগ পাইলাম—মা আর বাচ্চা উভয়ের পায়ের দাগ, পাশাপাশি, জলের কিনারায়। জল খাইয়া উঠিয়া গিয়াছে! বাচ্চাটা যখন বালির উপর শুইয়া রোদ পোহাইতেছিল তখন তাহার মা নিশ্চয়ই নিকটেই কোন ঝোঁপের আড়ালে বসিয়া আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। বাচ্চার উপর গুলি চালাইলে আর রক্ষা ছিল না, বাচ্চার শোকে আমাদিগকে (আর পিছনের খালাসীদিগকে) মূলার মতো চিবাইয়া খাইত। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে আমার হাতে বন্দুক ছিল না! হাতে বন্দুক থাকিলে হয়ত বা বাচ্চাটাকে মারিয়া ফেলিতাম। বাচ্চাটা একটা কুকুরের সমান উঁচু ছিল।

সেস্থান ছাড়িয়া চলিলাম। ততক্ষণে অন্য

খালাসীরা আসিয়া জুটিয়াছিল, তাহাদিগকে ১০।১২ মিনিট সেই জায়গায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি আর ফুদনা আবার পথ ধরিলাম। ক্রমে নদী ছাড়িয়া সার্ভেয়ারের কাটা লাইন ধরিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। অনেক জানোয়ারের পাঞ্জা চোখে পড়িল,—হরিণ, শূয়োর, একটা মিথনও জল খাইয়া গিয়াছে, তাহাদের দাগ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বন্দুক ঘাড়ে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম, বেলা প্রায় ৮টা। শুনিতে পাইলাম একটু সম্মুখে শুকনা পাতার উপর খুব খড়্ বড়্, খড়্ বড়্ শব্দ হইতেছে। "ক্যা হ্যায়রে?" ফুদনা বলিল, "হুজুর, টেঙ্গা হোগা।" টেঙ্গা এক রকম পাখি, শালিকের মত বড়, খয়েরি রং, বুক আর মাথার উপরের দিকটা শাদাপানা—২০।২২টা এক সঙ্গে থাকে। জঙ্গলে কোনও জানোয়ার দেখিতে পাইলে ইহারা সাধারণতঃ বড়ই চেঁচামেচি করিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দেয়। বলিলাম, "টেঙ্গা হ্যায় তো জমিনপর ক্যা করতা হ্যায়?" হুজুর, শুকনা পাত্তিপর লোটতা পোটতা।" আমার মন এই সোজা কৈফিয়তে প্রবোধ মানিল না—"টেঙ্গা মাটির উপর অমন লুটোপুটি খাইবে কেন?" বন্দুক ভরিয়া অগ্রসর হইলাম কিন্তু অতি সন্তর্পণে একেবারে যেন "হাঁটি হাঁটি পা পা!" ক্রমে যে জায়গায় শব্দ হইতেছিল, সেইখানটায় আসিলাম। ৮।১০টা টেঙ্গা বসিয়া রহিয়াছে কিন্তু গাছের উপর, আর আমাদিগকে দেখিয়াই তাহারা 'কিচির মিচির' করিতে লাগিল। ফুদনা একটু হাসিয়া বলিল, "ঐ দেখ হুজুর"। বলিলাম, "তা বটে, কিন্তু এরা তো গাছে আর আওয়াজ তো হচ্ছিল মাটির উপর, কি দেখে ওরা ওরকম লুটোপুটি খাচ্ছিল? কোথাও তো কিছু নাই?" আরও ৬।৭ কদম আগে গেলাম, "টাং", শব্দ করিয়া একটা প্রকাণ্ড সম্বর হরিণী সম্মুখ দিয়া দৌড়াইয়া লাইন পার হইয়া গেল। টেঙ্গাগুলি আবার চেঁচামেচি করিয়া উঠিল। ফুদনা বলিল, "ইসিকো দেখাথা, হুজুর।" আমার মন কিন্তু তাহাতে সায় দিল না, "মাত্র এই? তবে মাটিতে খড়্ বড়্ কেন? চেঁচামেচি করেনি তো?" আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলাম, কিছুই নাই। বন্দুকটা বড় ভারী—পৌনে আট পাউণ্ড। কার্ত্তুজ খুলিয়া ব্যাগ এ রাখিয়া বন্দুকটা ফুদনার ঘাড়ে চাপাইলাম। লাঠি হাতে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম কিন্তু তেমনি ধীরে ধীরে, পা টিপিয়া টিপিয়া। লাইনটা আঁকাবাঁকা, সম্মুখেই মোড়; হঠাৎ মনে হইল যেন মোড়ের পাশে ঝোপের মধ্যে একটা কিছু নড়িল—৩।৪ ধাপ দূরে হইবে। দুই জনেই দাঁড়াইয়া খুব মনোযোগের সহিত দেখিলাম কিন্তু কিছুই চোখে পড়িল না। ভাবিলাম হয়ত বা কোনও ছোট পাখি ছিল এক ডাল হইতে অপর ডালে লাফাইয়া গেল। আরও দুই তিন পা চলিয়া মোড়ের উপর আসিলাম, আর আকাশ পাতাল ফাটাইয়া গর্জ্জন করিয়া যেন একেবারে আমার পায়ের নীচ হইতে প্রকাণ্ড বাঘ পিছনের দুই পায়ের উপর দাঁড়াইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডিগ্‌বাজী খাইয়া ৭।৮ ফুট দূরে লাফাইয়া পড়িল। আবার সেই ভীষণ গর্জ্জন—আবার এক লাফ, আবার গর্জ্জন, আর আবার লাফ। তিন লাফে প্রায় ২০।২৫ ফুট দূরে চলিয়া গিয়াছে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কী ভীষণ গর্জ্জন! আমি তো প্রথম গর্জ্জন আর লাফের পরই পিছনে হাত বাড়াইয়া "বন্দুক, বন্দুক" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছি কিন্তু বন্দুক আর হাতে আসে না। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম বন্দুক দিবার শক্তি ফুদনার

নাই। তাহার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, হাত পা আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। এক পা পিছনে হটিয়া তাহার হাত হইতে বন্দুক লইলাম, বলিলাম "জলদী ছর্‌রা দেও।" বেচারা এমন ঘাবড়াইয়া গিয়াছে যে কার্ত্তুসের ব্যাগটা আর খুলিতে পারে না, কার্ত্তুসও বাহির করিতে পারে না। আমিই এক মুঠা কার্ত্তুস বাহির করিয়া লইলাম। তখনও বাঘের গর্জ্জনে বন জঙ্গল কাঁপিতেছে। বন্দুকে ছিটা ভরিয়া ঐ বাঘের দিকে মুখ করিয়া দুইবার বন্দুক আওয়াজ করিলাম, বাঘটা আরও দুইবার লাফ দিল—আবার গর্জ্জিয়া উঠিল; আমিও আরও দুইবার বন্দুক চালাইলাম। তখন বোধ হইল যেন বাঘটা দৌড়িয়া পলাইয়া গেল, গর্জ্জন থামিয়া গেল। আমি কিন্তু আরও দুইবার বন্দুক আওয়াজ করিলাম। বলিতে যত সময় লাগিল তাহার সিকি সময়ের মধ্যে অত সব কাণ্ড হইয়া গেল। বাঘের গর্জ্জন থামিয়া গেলে পর চারিদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, ব্যাপার কি? বাঘটা ওখানে শুইয়া কি করিতেছিল? ফদ্‌না ততক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, তাহার চোখ পড়িল আগে, "হুজুর, এই দেখ" বলিয়া মাটির দিকে আঙ্গুলের সঙ্কেত করিল। চাহিয়া দেখিলাম, আমার ৪।৫ ফুট সম্মুখেই, প্রকাণ্ড এক সম্বর হরিণ মরা পড়িয়া রহিয়াছে; তাহার আশে পাশে ৮।১০ ফুট জমি যেন একেবারে চষিয়া ফেলিয়াছে। সম্বরটার ঘাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, তাহার মুখ উপরের দিকে আর সিং মাটিতে, গলায় ৪টা ছিদ্র আর তাহা হইতে রক্ত বাহির হইতেছে—ছিদ্র ৪টি বাঘের দাঁতের চিহ্ন। পিছনের এক পায়ের হাঁটু ভাঙ্গা, একখানা চোঙ্গা হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে আর একটা ছোট গাছের সঙ্গে জড়ান রহিয়াছে—ঠিক যেন কেহ ইচ্ছা করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। পিছনের রাণের প্রায় দুই সের মাংস উড়িয়া গিয়াছে, সম্মুখের একটা রাণ হইতেও পোয়া তিনেক মাংস নাই। এইবার বুঝিতে পারিলাম যে এই দুইয়ের (বাঘ আর হরিণের) লড়াইয়ের হুড়্‌বড়ি আওয়াজ আমরা শুনিতে পাইয়াছিলাম। বাঘটা যখন প্রথম লাফাইয়া উঠিয়াছিল তখন ইচ্ছা করিলে আমার হাতের লাঠি দিয়া তাহাকে ছুঁইতে পারিতাম।

৫।৭টা বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া পিছনের খালাসীরা ধরিয়া লইয়াছে 'আজ জবর শীকার পড়িয়াছে', আর অর্দ্ধ মাইল দূর হইতে হল্লা করিতে করিতে আসিয়া হাজির হইয়াছে। ঘটনা স্থলে পঁহুছিয়া সব দেখিয়া শুনিয়া তো তাহাদের চক্ষু স্থির!' সকলে ফদনাকে চাপিয়া ধরিল, "তোম্ ডর গিয়াথা?" ফদনা সোজা মানুষ, বলিল, "হ্যাঁ ভাইয়া, বড়ি ডর লাগ গিয়াথা, মেরা খিয়াল হুয়া ক্যা সাহাব কো শের পাকড় লিয়া।"

শীকার যেই করুক মাংস তো জুটিয়াছে। খালাসীরা বলিল, "হুজুর ৮।১০ মিনিট সময় অপেক্ষা কর, আমরা মাংস নেব।" ওরা মাংস নেবে কিন্তু আমাকে বন্দুক হাতে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে—'আবার যদি বাঘ আসে? আমি বলিলাম, "আচ্ছা, কিন্তু বাঘের খোরাক ছেড়ে নিও আর জখমীদিকটা নিও না।" ওরা কুড়াল দিয়া দুখানা রাণ (কোমর হইতে ক্ষুর পর্য্যন্ত), এক পাশের পাঁজর ও পাছা কাটিয়া লইল। দুইজন খালাসীর বুক আর মাথাটাও লইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমি নিষেধ করিলাম। ভয় দেখাইলাম, "তা'হলে বাঘ তাঁবুতে আসবে। এমনি কাছাড়ের পাহাড়ের রাত্রে সফ্‌দর হুসেন বাবুর ডেরায় বাঘ এসে

হাজির হয়েছিল সমস্ত শীকারটা তারা নিয়ে এসেছিল বলে।" হতভাগারা সহজে ছাড়িতে চাহে কি? "গুলি মারিয়া তোদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিব" বলিয়া ভয় দেখাইয়া তবে ছাড়াইতে হইয়াছিল।

মাংস লইয়া চলিলাম এবং ১০।১২ মিনিটের মধ্যেই ফরেষ্টের সীমানার লাইনে পঁহুছিলাম। লোকগুলি যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, ১২ ফুট চওড়া লাইন, একেবারে পরিষ্কার, এইবার বেচারারা সোজা হইয়া চলিতে পারিবে। সীমানায় পঁহুছিয়া খালাসীরা বলিল, "হুজুর, জল খাব আর জিনিষগুলো একটু গুছিয়ে বেঁধে নিব, বড্ড ভারী হয়েছে।" আমি বলিলাম "আচ্ছা, ১২টা বাজে আমিও কিছু খেয়েনি।"

খাইতে বসিয়া যে দুইজন খালাসী হরিণটার বুক আর মাথা আনিবার জন্য জেদ ধরিয়াছিল সেই খালাসী দুইজনকে ডাকিলাম, বলিলাম, "যাও, গিয়ে হরিণের সিনা আর মাথাটা নিয়ে এসো, দশ টাকা বক্‌শিস দিব।" আমার টিণ্ডেল শীতল লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "হুজুর, ওরা যদি নিয়ে আসতে পারে তা' হলে আমরা চাঁদা তুলে আরো ১০৲ টাকা দেব।" তখন সকলে মিলিয়া উহাদিগকে ঠেলিতে লাগিল, "যাওনা, কেমন মরদ দেখি?"

ক্রমশঃ

দয়া

চীনা হো কোয়ানের মনটা দয়ায় ভরা। সে কখন কোন প্রাণীর প্রাণ নিত না। সে একটি জারে অনেক রূপা রাখতো। এক সময়ে সাদা পিঁপড়া—উই কেমন করে ওর মধ্যে ঢুকে পড়ে কিছু রূপা খেয়ে ফেললো। এমন অনিষ্ট হওয়াতে তার পরিবারের সকলে সাদা পিঁপড়াদের বাসা খুঁজে বার করলো। তারা মনে করলো যদি কতগুলি পিঁপড়া নিয়ে একটা পাত্রে রেখে সেগুলি আগুণে গলিয়ে নেয় তবে কিছু রূপা ফিরে পেতে পারে। কিন্তু হো কোয়ান কিছুতেই তাদের সে নিষ্ঠুর কাজ করতে দেবে না।

সে বলল—একটুখানি রূপার জন্য এতগুলি প্রাণীর প্রাণ যাবে! এ আমি সহ্য করতে পারব না।

সেই রাত্রিতে হো কোয়ান স্বপ্নে দেখলো যে সাদা পিঁপড়ারা দল বেঁধে এসে তাকে তাদের রাজার কাছে নিয়ে গেল। তারা রাজাকে বলল যে হো কোয়ান এত দয়ালু, তাদের প্রাণ রক্ষা করেছে। রাজা খুব খুসী হয়ে কোথায় মণি-মাণিক্য লুক্কায়িত আছে সে সন্ধান হো কোয়ানকে বলে দিলেন।

হো কোয়ান ভোরে জেগে উঠে স্বপ্নের নির্দ্দেশ মত সেই গোপন যায়গা খুঁড়ে সত্যি সত্যি মণি-মাণিক্য পেলো।

জন্ম-দুঃখী

শ্রীতেজেশ চন্দ্র সেন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মোজেঁদ্রো আবার বলতে লাগলো—"যতই আমি বুড়ো হচ্ছি ততই এমনভাবে একাকী বাস করা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠছে। আগে কাজে কর্ম্মে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখন আমি আর কাজেও মন দিতে পারিনে। এখন আমার কোন কিছুই ভালো লাগে না। তাই আমি সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। দেখি তাতে মনে শান্তি পাই কিনা।"

এই কথা বলবার সময় তার অজ্ঞাতসারেই লুভোর ছেলেমেয়েদের উপর তার দৃষ্টি পড়লো। ঠিক এই সময়ে ভিক্টর ও ফ্লেরাণ বনের ভিতর হ'তে বের হয়ে এলো পিঠে শুক্‌নো ডালপালার বোঝা নিয়ে। দূর থেকেই মোজাঁদ্রোকে দেখতে পেয়ে কাঠের বোঝা সেখানে ফেলে রেখেই তাড়াতাড়ি তারা ছুটে এলো তার কাছে।

মোজাঁদ্রো পূর্ব্বের মতই খুশী হয়ে তাদের কাছে বসালো। লুভোর নীরব মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, "ভাই, তুমিই সুখী। তোমার চার চারটি ছেলেমেয়ে আর আমি আজ নিঃসন্তান।"

তারপরেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো,"সেজন্য কাউকে আমি দোষ দিতে পারিনে। আমার নিজের দোষেই আজ আমার এ দশা!"

সে লাঠি ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। তার সঙ্গে অন্য সকলেও দাঁড়ালো।

ভিক্টরকে কাছে টেনে নিয়ে তার দু' কাঁধে দু' হাত রেখে একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, "ভিক্টর ভাই বিদায়! আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও, কাজে কর্ম্মে লেখা পড়ায় তোমার মন হোক। তোমার মা বাপকে শ্রদ্ধা ভক্তি করো, তারা তোমার জন্য অনেক করেছেন।"

এই বলে তার কাঁধে হাত রেখে একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললো, "আমার ছেলেটি থাকলে সেই আজ তোমারই মতো হতো।"

লুভো কাছে বসে বসে সব শুনছিলো। তার মুখে কোন কথা নেই, মুখে বিরক্তি ভাব সুস্পষ্ট। মনে মনে সে বলছিলো, "হতভাগাটা যাবে কখন?"

কিন্তু মোজাঁদ্রো উঠে কিছু দূরে চলে যেতেই তার জন্য লুভোর বড় দুঃখ হতে লাগলো। সে পিছন হতে ডেকে বললো, "মোজাঁদ্রো এসনা হে, এখানেই চারটে খেয়ে যাওনা।"

কিন্তু এই নিমন্ত্রণে যে-কণ্ঠস্বর প্রকাশ পেলো তাতে নিমন্ত্রণ রক্ষার উৎসাহ কারোরই হবে না। মোজাঁদ্রো মাথা নেড়ে বললো, "না ভাই ক্ষিদে আমার নেই। আর নিজের মনে যখন সুখ নেই তখন অন্যের সুখে মনে শান্তি আসে না।"

এই বলে লাঠিতে ভর দিয়ে সে ধীরে ধীরে চলে গেলো।

সেদিন লুভো কারো সঙ্গে একটি কথাও বললে না। রাত্রিটা কাটালো সে নৌকোর ছাদে পায়চারী ক'রে। ভোর হ'লে কাউকে কিছু না বলে সে নৌকো হতে বের হয়ে গেলো।

সে বরাবর সোজা চলে এলো পাদ্রি মহাশয়ের কাছে।

পাদ্রি মহাশয়ের বাড়ী গির্জ্জাঘর সংলগ্ন। চৌকোণো একটি ঘর। সামনে একটি উঠান, পিছনে ছোট একটি শবজীর বাগান। উঠানে একদল মুরগী চরছে, পিছনের বাগানে খুঁটিতে বাঁধা একটা গাই হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে।

পাদ্রি মহাশয়ের বাড়ীর কাছে আসাতেই লুভোর মনের ভার যেন হাল্‌কা হয়ে গেলো। গেট খুলে সে যখন ভিতরে ঢুকলো তখন তার মনে হলো সে এখন সম্পূর্ণ হালকা মন নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারবে।

লুভো যখন ঘরে ঢুকলো তখন পাদ্রি মহাশয়ের দুপুরের খাওয়া শেষ হয়েছে। তিনি একটা বই হাতে নিয়ে আরাম কেদারায় ঠেসান দিয়ে বসে আছেন—মাঝে মাঝে তন্দ্রায় তাঁর চোখ বুজে আসছে। লুভো ঘরে ঢুকতেই পাদ্রি মহাশয়ের তন্দ্রা কেটে গেলো। তিনি উঠে বসে বইয়ের পাতা বন্ধ করে লুভোকে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, "লুভো, কেন এসেছো, কোন দরকার আছে কি?"

"কর্ত্তা একটা বিষয়ে আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি। যদি অনুমতি করেন তাহলে গোড়া থেকেই আপনাকে সব কথা বলি। কর্ত্তা আপনি তো জানেনই আমার বুদ্ধিটা তেমন পাকা নয়। আমার স্ত্রীও বলে আমি ঈগল নই।"

এইভাবে সঙ্কোচের প্রথম বাঁধা কেটে গেলে লুভো টুপিটা মাথা হতে নামিয়ে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পাদ্রি মহাশয়কে তার পরামর্শের বিষয় বলতে লাগলো।

"কর্ত্তার হয়তো মনে আছে মোজাঁদ্রো বলেছিলো তার স্ত্রী নেই। ১৫ বৎসর ধরে সে বিপত্নিক হ'য়েই আছে। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে তার একটি ছেলে হওয়ার পর তার স্ত্রীকে সে পাঠিয়ে দিয়েছিলো প্যারী নগরীতে দুধ-মায়ের কাজ করতে। সেখানে ডাক্তার তার ছেলেটিকে পরীক্ষা করে দেখলে। তার স্ত্রী ছেলেটিকে বুকের শেষ দুধ খাইয়ে তাকে সঁপে দিলো একজন 'মেনাজের' হাতে।

পাদ্রি মহাশয় তার কথায় বাধা দিয়ে বললেন—লুভো মেনাজটা আবার কে হে?

"কর্ত্তা, মেনাজ যে-স্ত্রীলোক দুধ-মায়ের ছেলেকে তার বাড়ী পৌঁছে দেয় তাকে বলে। তাদের একটা ঝুড়ি থাকে। সেই ঝুড়িতে করে বেড়ালের ছানার মতো ছোট ছেলে মেয়েদের তারা নিয়ে যায়।"

"এ দেখছি এক অদ্ভুত ব্যবসা।"

"হাঁ কর্ত্তা। এদের মধ্যে অনেক ভালো স্ত্রীলোকও থাকে। মা-মোজাঁদ্রো পড়েছিল যার হাতে সে-স্ত্রীলোকটা ছিল একটা ডাইনী। ছোট ছেলেমেয়েদের চুরী করে নিয়ে যাওয়াই ছিল তার ব্যবসা। ছোট ছেলেমেয়েদের চুরী করে নিয়ে অন্যের কাছে ভাড়া দিতো অথবা বিক্রি করে দিতো। তারা আবার সেই সব ছোট্ট ছেলেমেয়েদের দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করিয়ে পয়সা উপার্জ্জন করতো।"

"একি তুমি, সত্যি কথা বলছো?"

হাঁ কর্ত্তা, এক বর্ণও মিথ্যে নয়।

এই ডাইনীটা এভাবে অনেক ছেলেমেয়েকে চুরী করে নিয়ে গিয়েছিলো। মোজাঁদ্রোর ছেলেটিকে সে চুরী করে নিয়ে গিয়ে চার বৎসর তার কাছে রাখে। তাকে দিয়ে বুড়িটা ভিক্ষা করাতে চেষ্টা করতো। কিন্তু সে ছিলো ভদ্র ঘরের সন্তান, তার বাপ ছিলো সৎ লোক। কাজেই তাকে দিয়ে রাস্তায় কিছুতেই ভিক্ষে করানো গেল না। তখন বুড়িটা রেগে ছেলেটিকে রাস্তায় ফেলে চলে গেলো। তখন ছেলেটার কী অবস্থা হলো কর্ত্তা আপনিই অনুমান করতে পারেন। আজ ৬ মাস হলো সেই ডাইনীটা হাঁসপাতালে রোগশয্যায় নিজের দুষ্কর্ম্মের অনুতাপ সইতে না পেরে পুলিশের নিকট নিজের সব অপরাধ স্বীকার করেছে। কর্ত্তা, সেই ছেলেটিই ভিক্টর।"

পাদ্রি মহাশয়ের হাত থেকে ধপাস্ করে বইটা পড়ে গেলো। তিনি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভিক্টর মোজাঁদ্রোর ছেলে?"

"হাঁ কর্ত্তা।"

পাদ্রি মহাশয় একেবারে অবাক হ'য়ে গেলেন। নিজের মনেই তিনি যেন কী বলতে লাগলেন। তার ভিতর থেকে শুধু "বেচারা" "ভগবানের ইঙ্গিত" এই দু'টি কথা বোঝা গেলো। হঠাৎ তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তিনি চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন, একবার জানালার কাছে গিয়ে ঢক ঢক করে এক গ্লাশ জল খেয়ে ফেললেন। তারপর তিনি আস্তে আস্তে লুভোর কাছে এসে কোমরবন্ধে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি এই সময়ের উপযোগী শাস্ত্র থেকে একটা বয়েদ আওড়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোন বয়েদই তিনি তখন মনে করতে পারলেন না। তারপর তিনি অতি ধীরে ধীরে বললেন, "লুভো ছেলেটিকে তো তার বাপকে ফিরিয়ে দিতে হবে।"

"কর্ত্তা সেই পরামর্শ নিতেই তো আপনার কাছে এসেছি। ৬ মাস হলো আমি এ কথা জেনেছি। কিন্তু

এতদিন আমি কাউকে বলিনি, এমন কি আমার স্ত্রীকেও নয়। কর্ত্তা,ভিক্টরের জন্য আমরা অনেক দুঃখ কষ্ট ভুগেছি। দুঃখে কষ্টে সে আমাদের সঙ্গে একত্রে মানুষ হয়েছে। আজ কী করে তাকে ছেড়ে দিই। কর্ত্তা, কিছুতেই আমি মনে জোর পাচ্ছিনে।"

লুভোর একটি কথাও মিথ্যে নয়। মোজাঁদ্রোর জন্য মায়া হ'লেও লুভোর জন্যও দুঃখ হওয়া উচিত। ভিক্টরের জন্য বেচারাকে কম দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ করতে হয়নি। এই দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের সঙ্গে লড়াই করে পাদ্রি মহাশয় একেবারে ঘেমে ওঠলেন। তিনি তাঁর কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য আলো পাবার আশায় ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করে তিনি বারবার উপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর মনের দ্বিধা কিছুতেই ঘুচল না। তখন তিনি লুভোর আরো কাছে এসে আস্তে আস্তে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "লুভো তুমিই বলো আমার অবস্থায় পড়লে তুমি কী পরামর্শ দিতে?"

লুভো পাদ্রি মহাশয়ের পায়ের জুতোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, "কর্ত্তা, আমি বুঝতে পারছি ভিক্টরকে আমার ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত। কাল মোজাঁদ্রো আমাদের এখানে এসেছিলো। বেচারাকে দেখে আমার মনে তখন এ কথাই হচ্ছিল। বেচারা বুড়ো হয়েছে, কেউ তার নেই, মনের সুখ শান্তি সে সব হারিয়েছে। যখনই তাকে দেখি তখনই নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। মনে হয় তার টাকা চুরী করে যেন আমি নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছি। কর্ত্তা আমার মনের এ যন্ত্রণা আমিও আর সহ্য করতে পারছিনে। তাই আজ আমি এসেছি আপনার কাছে পরামর্শের জন্য।"

"লুভো, তুমি খুব ভালো কাজ করেছো।" তাঁর মনের দ্বিধা এ ভাবে কাটিয়ে দেওয়ায় পাদ্রি মহাশয় মনে মনে লুভোর উপর খুসী হলেন। তখনি তিনি আবার বললেন, "লুভো এখনি চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। দেরী হলেও ভুল সংশোধন করতে কোন ক্ষতি নেই। মোজাঁদ্রোর কাছে গিয়ে তোমাকে সব কথা বলতে হবে।"

"কর্ত্তা, আজ মাপ করুন, কাল যাবো।"

"না লুভো কাল নয়, আজই, এখনই।"

বেচারা লুভোর হতাশ ভাবের দিকে তাকিয়ে পাদ্রি মহাশয়ের মনেও করুণার সঞ্চার হলো। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "লুভো তোমাকে অনুনয় করে বলছি এখনি চলো। একবার যখন মনে সৎ সঙ্কল্পের উদয় হয়েছে তখন আর তাকে নিবতে দেওয়া উচিত নয়। আর দেরী নয়, এখনি চলো।"

"আস্‌ছে ফাল্‌গুন"

শ্রীফকীর চন্দ্র সুকুল

কী শোভা বিকাশে
বিমল আকাশে,
কুসুম কাননে,
পল্লী-পরাণে
কান পেতে ঐ শুন্
আস্‌ছে কাল্‌গুন।

উঠিছে ডাকিয়া
বনেতে পাপিয়া,
নতুন পল্লবে,
মুকুল-সৌরভে
ভ্রমর গুণ্ গুণ্
আস্‌ছে কাল্‌গুন।

বিথীতে কুঞ্জে
পুঞ্জে পুঞ্জে
ঐ যে ফুলরাশি,
গন্ধে ওঠে হাসি;
খুসীতে দুই গুণ
আস্‌ছে ফাল্‌গুন।

দখিনা সমীরণ
আনেরে শিহরণ,
নিখিল বিশ্বে,
মোহন দৃশ্যে,
শিশুরা গায় শুন্
আস্‌ছে ফাল্‌গুন।

মায়ের বিলাতের চিঠি

শ্রীকমলা দাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আদরের বাবলু ও টুলটুল,

সেখানে চা খেয়ে আবার পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। মেয়ে দুটি দাঁড়িয়ে যতদূর আমাদের দেখা যেতে লাগলো হাত নাড়তে লাগলো। ক্রমে আমরা একেবারে চূড়ায় এসে পড়লাম। উপর থেকে কি চমৎকার দৃশ্য। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সারা সুইটজারল্যাণ্ড দেখলে মনে হয় যেন ফুলের সাজে সেজে রয়েছে। আর তার সঙ্গে এদেশের লোকগুলিও সর্ব্বদা হাসিমুখ। ইংল্যাণ্ড কিন্তু এ বিষয়ে একেবারে পিছিয়ে রয়েছে। সেখানকার ঘর বাড়ীও দেখতে যেমন, লোকগুলির মুখেও তেমন হাসি নাই। তারা সহজে কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করে না।

বেডেন ছোট্ট গ্রাম হলেও মনে করো না আমাদের সেই গরীব গ্রাম—যার রাস্তা অন্ধকার—মিউনিসিপ্যালিটি নাই, আরও কত দুরবস্থা। এখানে সুন্দর রাস্তা, ইলেক্‌ট্রিক লাইট আছে। যদিও বড় রাস্তা মাত্র দুটি, তাতেই কয়েকটি হোটেল আছে, বড় বড় দোকান আছে, বায়োস্কোপ অমনিবাস—সবই আছে। তবে ট্রাম নাই আর ট্যাক্সি মাত্র ৮টি—আধ ঘণ্টা অন্তর ট্রেণ আসে। অনেক লোক রোজ সহরে কাজ করতে যায়।

সেদিন রাত্রে খাওয়ার পর হোটেলে দুই তিন জন রুশ ছিলেন—সকলে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন।

২৬শে সকালে উঠেই তাড়াতাড়ি স্নান করে খেয়ে ৯টার ট্রেণে ২০ মিনিট পরে জুরিক-এ এসে পড়লাম। ষ্টেশনের কাছে টুরিং হোটেলে উঠলাম।

জুরিক সুইটজারল্যাণ্ডের সব চেয়ে বড় সহর। এখানে একটি পাহাড়ী নদী ও খুব বড় হ্রদ আছে। পাহাড়ের পর পাহাড়ে হ্রদটি ঘিরে আছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাড়ী পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত বাস ও ট্রাম চলে। অনেক থিয়েটার ও সিনেমা আছে। খুব বড় একটি চিড়িয়াখানা আছে।

সমস্ত হ্রদটির ধারে বেড়াবার জন্য সুন্দর রাস্তা আছে। বসবার জন্য অনেক বেঞ্চ রয়েছে। বিকালে হ্রদের ধার লোকে লোকারণ্য। এখানে সব যায়গায় সামুদ্রিক চিল অজস্র দেখতে পাওয়া যায়। এদেশে ঐ পাখী কাহারও মারবার হুকুম নাই। এখানে তাই হাজার হাজার পাখী এক সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়, সমস্ত হ্রদ সাদা হয়ে গিয়েছে।

২৭শে—আজ ঠিক হলো এরোসা বলে একটি যায়গায় বেড়াতে যাওয়া হবে; সেখানে এখন সমস্ত বরফে ঢেকে গিয়েছে শুনে যাবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠলো। আমরা এতদিন পর্য্যন্ত যত যায়গায় বেড়িয়েছি বরফে ঢাকা দেশ একটিও দেখি নাই। তাই বরফে ঢাকা দেশ দেখবো বলে খুব আনন্দ হতে লাগলো।

সকাল বেলা চা খেয়ে ৯টার সময় ভাল করে গরম কাপড় পরে ও আরও কতক গরম কাপড় সঙ্গে নিয়ে ট্রেণে চড়লাম। লেকের ধার দিয়ে ট্রেণ চলেছে। চারিদিক এখনও সবুজ। তার

মধ্যে ছবির মত বাড়ীগুলি ভারি সুন্দর লাগছে।

জুরিকের লেকটিও খুব বড়, নদী বলে ভুল হয়! ঐ লেকের পাশ দিয়ে এসে আমরা একটি উপত্যকায় পড়লাম। দু' পাশে উঁচু পাহাড়, সাদা বরফ মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে, তার মাঝে মাত্র আধ মাইল অথবা তার চেয়েও কম সমতল ভূমি, তারি ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। একটু পরেই দেখি একদিকে পাহাড়ের কোলে একটি ছোট পাহাড়ী নদী, তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে।

ক্রমে পাহাড়ের পর পাহাড় ছাড়িয়ে আমরা "কুর" বলে একটি যায়গায় এসে পড়লাম। এখান থেকে খুব ছোট একটি ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণ পাহাড়ের উপর দিয়ে "এরোসা" পর্য্যন্ত যায়। ট্রেণ প্রায় ট্রামের মত।

এখানে আমাদের এক ঘণ্টা খাবার জন্য ট্রেণ থামবে শুনে ষ্টেশনের রেষ্টুরেণ্টে খেয়ে নিলাম। তখন বেলা ১২টা। তারপর সুরু হলো আমাদের যাত্রা। ট্রেণটি আস্তে আস্তে পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলো। ক্রমে আমরা কাছেই বরফ পেতে লাগলাম। মাটিতে, গাছের পাতায়, বাড়ীর ছাদে, পেঁজা তুলার মত পড়ে আছে। অত কাছে ঐ বরফ দেখে তোমার দিদিতো খুব লাফালাফি করতে লাগলো। আমরাও এত আনন্দ পাচ্ছিলাম যে কেউ না থাকলে বোধ হয় ঐ রকমই চেঁচাতাম।

একটি ষ্টেশনে ট্রেণটি একটু বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। অমনি তোমাদের দাদু নেমে গিয়ে দুহাতে করে খানিকটা বরফ এনে তোমার দিদির হাতে দিলেন! বরফগুলি যেন গুঁড়ো নুনের মত, খুব চেপে ধরলে জমাট হয়ে যায়।

আবার ট্রেণ চললো। দুপাশে ঘন সবুজ পাইন বন। মাটী সব ২।৩ ফুট বরফে ঢাকা। হঠাৎ দেখি এক যায়গায় বনের মধ্যে মস্ত বড় দুইটি হরিণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুনলাম, ঐ সব বনে হরিণ ও ভাল্লুক পাওয়া যায়।

ক্রমে ক্রমে এরোসা সহরে এসে পড়লাম। ট্রেণে বসেই দেখছিলাম পৃথিবীর শুভ্র রূপ। কোথাও অন্য কিছুই নাই, শুধু বরফ। সেই বরফের উপর এসে ট্রেণ থামলো। আমরা নেমে দেখি এত উঁচুতে চারিদিকে বরফের পাহাড়ের দেওয়াল দেওয়া একটি লেকের সামনে ট্রেণটা দাঁড়িয়েছে। লেকের জলও জমে সাদা হতে আরম্ভ হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হতে লাগলো এই পাহাড় ঘেরা যায়গার বাইরে যাবার বুঝি রাস্তা নাই। আমরা যেন অন্য এক জগতে এসে পড়লাম, হেঁটে লেকের চারিদিকে ঘুরলাম। অনেক যায়গায় বরফের মধ্যে পা ঢুকে যেতে লাগলো। নদীর বালীতে হাঁটলে যেমন হয় তেমনি। এখন বরফ বেশী পড়েনি আর শক্ত হয় নাই, সে জন্য লোকও বেশী আসে নাই। তবু সেখানেও পাহাড়ের উপরে অনেক বাড়ী, দোকান ইত্যাদি। যখন খুব বরফ পড়বে আর অনেক উঁচু হবে ও শক্ত হবে, তখন এখানে ঘোড়-দৌড় হবে, এরোপ্লেন এসে ঐ লেকের উপর নামবে, লেকে স্কেচিং ও স্কি খেলবে।

বেলা ২টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত সেখানে ছিলাম। তিনটার সময় সূর্য্য অস্ত গেল, সমস্ত সাদা পাহাড় সূর্য্যাস্তের লাল আভায় রাঙ্গা হয়ে উঠলো। আমরা দাঁড়িয়ে সেই অপরূপ দৃশ্য দেখতে লাগলাম। চারটের সময় অন্ধকার হয়ে এলো। চারিদিকে আলো জ্বলে উঠলো। আমাদের নিয়ে ট্রেণ আবার ফিরে চললো।

একটা কথা শুনলে তোমরা আশ্চর্য্য হবে। এখন এখানকার উত্তাপ মাত্র ৯ ডিগ্রি।

রাতের অন্ধকারে জুরিকে ফিরে এলাম।

আগে থেকেই ঠিক ছিল আজ ফ্লোরেন্স যেতে হবে, তাই তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিলাম। ফ্লোরেন্স যেতে রাস্তায় অনেক হ্রদের ধার দিয়ে অনেক টানেল পার হয়ে যেতে হয়। ৯ মাইল লম্বা সেণ্ট গোথার্ড টানেল পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। ঐ সুড়ঙ্গ পার হয়ে যেই আমরা আলোয় বার হলাম অমনি দেখি সারা দেশ একেবারে বরফে ঢেকে গিয়েছে।

অনেকক্ষণ অন্ধকারে থেকে হঠাৎ যে এমন একটি দৃশ্য দেখবো তা কল্পনাই করিনি। কিন্তু যখন দেখলাম রাস্তা, বাড়ী, দরজা, জানালা সব বরফে বুঁজে গিয়েছে, যতক্ষণ না বরফ কাটা গাড়ী এসে বরফ পরিষ্কার করবে, ততক্ষণ লোকে বার হতে পারবে না, রাস্তায় হাঁটতে পারবে না, তখন মনে হলো যে ওদের কত কষ্ট হচ্ছে। তা ছাড়া এত মাইলের পর মাইল পৃথিবীর সাদা রূপ যেন মনটাকে বিষন্ন করে ফেলছিল। মনে হচ্ছিল যে পৃথিবী রিক্তা হয়ে গিয়েছে। অনেকক্ষণ আর এ ভাবে থাকতে হলো না। আবার আমরা সুন্দর সবুজ দেশে এসে পড়লাম।

সকাল ৮টায় বেরিয়ে ১১ ঘন্টা ট্রেণে বাস করে সন্ধ্যা ৭টায় ফ্লোরেন্স এসে নামলাম।

২৯শে যখন এখানে নামলাম তখন একেবারে রাত্রি হয়ে গেছে। এখন এ সব দেশেই বিকেল ৪টা বাজলেই সন্ধ্যা হয়ে যায়। এসেই একটা বড় হোটেলে উঠলাম। বাড়ী নদীর উপর। খুব পুরাণো, বড় বাড়ী। কত ঘর, কত বারান্দা, কত যে সিঁড়ি তা বলে শেষ করা যায় না। রাত্রের মত খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম।

আজ সকালে কুকের আফিসে গিয়ে ঠিক হলো —দুই বেলায় এখানকার যা যা আছে দেখাবে।

প্রথমেই আমাদের একটি চার্চ্চে নিয়ে গেল। মেডিসি রাজ বংশধরদের তৈরী বলে এটির নাম "চ্যাপেল অফ মেডিসি।"

মেডিসির বংশের যত লোক মারা গিয়েছেন, তাঁদের সকলের সমাধি এখানে আছে। মেডিসি রাজবংশের এখন যাঁরা আছেন তাঁদেরও সমাধি ঐখানেই হয়।

প্রসিদ্ধ প্রস্তর নির্ম্মেতা মাইকেল এঞ্জেলোর তৈরী প্রস্তর মূর্ত্তি এখানে কয়েকটি আছে। আর বিশেষ লক্ষ্য করবার জিনিষ চার্চ্চের মোজেকের কাজ। ১৬টি দেশ থেকে ৩৬ রকম রংয়ের পাথর এনে এই চার্চ্চের দেয়াল ও মেজের রং ফলানো হয়েছে। দেখলে মনে হয় যেন বিখ্যাত চিত্রকর তুলি দিয়ে এঁকেছেন;

চার্চ্চ দেখা শেষ করে ইটালির বিখ্যাত কবি "দান্তের" বাড়ী দেখতে গেলাম। বাড়ীর ভিতরে বা বাইরে দ্রষ্টব্য কিছু নেই। তবে বিশেষ ব্যক্তির বাড়ী বলে সকলে দেখতে যান।

এখান থেকে ব্যাপটিস্ট্রী দেখতে গেলাম। এটিও একটি চার্চ্চ। এখানে এখানকার সমস্ত ছেলেকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। এই চার্চ্চে আমাদের দেশের উপাসনা মন্দিরের মত পুরুষ ও স্ত্রীলোক-দের বসবার স্থান স্বতন্ত্র। কিন্তু ইংলণ্ডে সবাই এক সঙ্গে বসেন। এই চার্চ্চের মেজেতে আমা-দের দেশের রাশীচক্রের ছবি পাথর বসিয়ে তৈরী করা দেখে আমরা সত্যিই অবাক হয়ে গিয়ে-ছিলাম।

এই চার্চ্চের ব্রঞ্জের তৈরী একটী দরজা আছে। এত সুন্দর তার কারুকার্য্য যে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। শুনলাম সাতাশ বৎসর ধরে ঐ দরজাটী তৈরী হয়েছিল।

চার্চ্চ থেকে বেরিয়ে পাশেই একটী টাওয়ার

তৈরী হচ্ছে দেখাতে নিয়ে গেল। টাওয়ারটীর মোজেকের কাজ দেখবার উদ্দেশ্যই প্রধান।

এখান থেকে আমরা ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত ক্যাথিড্রেল দেখতে গেলাম। যখন আমরা হলের ভিতর ঢুকলাম তখন উপাসনা হচ্ছে। খালি পুরুষরা আছেন আর তোমাদের মত ছোট ছোট ছেলেরা এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই এক সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। আমরাও খানিক ক্ষণ দাঁড়ালাম। চার্চ্চের ভিতরের একটা পবিত্র ভাব, আমাদের খুব ভাল লাগলো।

এর পর দুটী স্কোয়ার ও বিখ্যাত পিক্‌চার গ্যালারি "ইউফিজি" দেখতে গেলাম। এখানে সুপ্রসিদ্ধ মাইকেল এঞ্জেলো ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ চিত্রকরের আঁকা অনেক ছবি আছে। কতকগুলি অতি পুরাতন কার্পেটও এখানে সাজানো আছে।

সকাল বেলা এই পর্য্যন্ত দেখিয়ে দুপুরের খাওয়ার জন্য হোটেলে ফিরে এলাম। আবার আড়াইটা থেকে বেড়াবার সময় ঠিক হলো।

সকালে যা দেখেছিলাম সবই ফ্লোরেন্সের পুরাতন অংশে অবস্থিত। বিকালে গাইড আমাদের প্রথমেই নূতন অংশ দেখাতে নিয়ে এলো। পুরাতন অংশে সরু সরু রাস্তা, প্রকাণ্ড ভারি ভারি পাথরের তৈরী বাড়ী, দোকানে, গাড়ীতে, ঘোড়াতে, মোটরে সব ঠাসা। নূতন অংশে সুন্দর সুন্দর পার্ক, ফোয়ারা, চমৎকার চমৎকার বাড়ী দিয়ে সাজানো।

সমস্ত সহরটী ঘুরে বুঝলাম নয়টী পাহাড় সমস্ত সহরটী ঘিরে আছে। সহরটীকে একটী নদী দুই ভাগ করে রেখেছে।

বিকালে একটী পাহাড়ের উপর মাইকেল এঞ্জেলোর স্কোয়ার দেখতে গেলাম। এই পার্কের বিশেষত্ব এই যে এখানকার বেড়ার গাছ ও ভিতরের বড় বড় গাছ ছেঁটে নানা রকম আকার করে বাগানটী সাজানো হয়েছে।

এই পার্কটী ও অন্য একটা আর্ট গ্যালারি দেখে আমরা ইটালির বিখ্যাত পাথরের কাজের কারখানা দেখতে গেলাম। এত আশ্চর্য্য পাথরের কাজ জীবনে কখনও দেখি নাই। কালো বা সাদা পাথরের ভিতর রঙীন পাথর কেটে কেটে বসিয়ে এমন সুন্দর গোলাপগুচ্ছ প্রজাপতি। নানা রকম দৃশ্য, মানুষ ইত্যাদির স্বাভাবিক রং করেছে যে আমরা প্রথমে ভাবতেই পারি নাই সেগুলি রং করা নয়।

এই কারখানা থেকে বেরিয়ে কবি দান্তে, বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও ও চিত্রকর মাইকেল এঞ্জেলো প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ লোকের সমাধি দেখতে গেলাম। এঁদের বিষয় কত পড়েছি, কত শুনেছি, কিন্তু কখনও কি ভেবেছি এঁদের সমাধির পাশে এসে দাঁড়াবো?

এঁদের সমাধি দেখে ইটালির চামড়ার কাজের কারখানায় গেলাম। এই সব কাজই আজকাল বিশ্বভারতীতে হয়। তোমরা অনেক দেখেছ। আজই যা দেখবার সব দেখা গেল। এখানকার সব যায়গায় সহর দেখবার এত সুন্দর ব্যবস্থা আছে যে কোন বিদেশীর পক্ষে কোন কষ্ট হয়না।

কাল আমরা রোম-এ যাব। আমরা যেন বেদের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানে দুই দিন, ওখানে চার দিন, এই করেই সময় চলে যাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

পিক্ নিক্

শ্রীমোহিত নাথ ঘোষ

নন্তুরা ঠিক করলে যে এবার তারা পিক্‌নিক্ করবে। দলের সবাই এক টাকা করে চাঁদা দিতে রাজী হলো। দলের সর্দ্দার নন্তু পীণ্টুকে বললে, "দ্যাখ পীণ্টু, তোরা তো বড়লোক, তোর অন্ততঃ দশটা টাকা চাঁদা দিতে হবে, বুঝলি।"

—"দশ টাকা! অতো আমি দিতে পারবো না ভাই। বাবা এখানে থাকলে হয়তো দিতে পারতুম, কিন্তু তিনি যে কোলকাতায় থাকেন; মা'র কাছে তো টাকাই থাকে না; আর ঠাকুর্দ্দা যা কিপ্টে তা তো তোরা জানিস ভাই" —বিষন্ন মুখে পীণ্টু বলে।

শৈলেন বললে, "যেমন কোরেই হোক তুই যদি দশটা টাকা দিতে না পারিস তবে তোকে আমাদের দল থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে; আর আমরা সবাই মিলে তোকে 'বয়কট' করবো।"

দলের অন্যান্য সবাই শৈলেনকে সমর্থন কোরলে। পীণ্টু কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, "অত টাকা আমি কি কোরে দেবো ভাই।"

সর্দ্দার নন্তু গম্ভীর স্বরে বললে, "শোনো পীণ্টু, তোমায় আমরা দু' দিন সময় দিচ্ছি। তুমি এই টাকা দিতে পারবে কিনা তা দুদিন পর আমাদের জানাবে।"

পীণ্টুর অবস্থা কাহিল, সে কোন মতে বললে "আচ্ছা।"

* * *

সন্ধ্যাবেলা পীণ্টু ঠাকুর্দ্দাকে ধরে পড়ল, "ঠাকুর্দ্দা, এবার আমরা পিক্‌নিক্ করবো।"

ঠাকুর্দ্দা তামাক খাচ্ছিলেন, ভুড়ভুড় করে টান্‌তে টান্‌তে বললে, "বেশ, বেশ!"

—"দশটা টাকা দিন না, ঠাকুর্দ্দা!"

—"হ্যাঁ, দশ টাকা? দুষ্টু ছেলে কোথাকার!! আমার টাকার গাছ আছে না? বেরো আমার ঘর থেকে, বেরো।"

—ঠাকুর্দ্দার তাড়া খেয়ে পীণ্টু শোবার ঘরে চুপচাপ বসে ভাবতে লাগলো, কি কোরে আদায় করা যায় এই টাকাটা! দশটা টাকা দিতে না পারলে তো তাকে তাড়িয়ে দেবে দল থেকে। সবাই মিলে তাকে 'বয়কট' কোরবে। কি করা যায় এখন?······ভাবতে ভাবতে পীণ্টু ঘুমিয়ে পড়লো।

দিদি এসে ডাকলেন, এই পীণ্টু ওঠ, ভাত খাবিনে?

—"না দিদি, আজ আমি খাবো না, আমার শরীরটা ভাল নেই। আমায় বিরক্ত কোরো না।"

—"ছেলের ঢং দেখ না"—দিদি রেগে-মেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পীণ্টু আবার গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলো।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার চোখ দুটো জলজল কোরে উঠলো—হ্যাঁ, ঠিক, এই ভাবেই টাকা আদায় করতে হবে ঠাকুর্দ্দার কাছ থেকে। যে কিপ্টে বাবাঃ।

* * *

ভোর না হতেই পীণ্টু ছুটলো নন্তুদের বাড়ী। নন্তু জিজ্ঞেস করলে, "কি রে পীণ্টু এই ভোরে যে?"

—"ভাই টাকা আমি দেবো তোদের; দশটাকা তো নিশ্চয় দেব; কিন্তু তোকে একটা কাজ করতে হবে, বুঝলি"—পীণ্টু মহা উৎসাহের সঙ্গে বলে।

—"কি ব্যাপার রে?"—নন্তু শুধায়।

পীণ্টু কাণে কাণে কি যেন বললে। নন্তু ফুর্ত্তির চোটে লাফিয়ে ওঠে। পীণ্টু বলে—পারবি তো?'

—'নিশ্চয়।'

—'আজ সন্ধ্যার পরেই, বুঝলি তো?'

—'আচ্ছা, আচ্ছা'—নন্তুর আনন্দ আর ধরে না। পীণ্টু এসে বললে,— 'একটা গল্প বলুন না ঠাকুরদা!'

—'না, না, গল্প আ'র শোনে না। পড়্‌গে যা।'

—'বেশী নয় ঠাকুরদা, শুধু একটা!

—'কি নাছোড়বান্দা ছেলে রে বাবা। শোন তবে···

ঠাকুরদা হুঁকোতে দু চারটে টান দিয়ে বলা সুরু করলে—'এক রাজ্যের রাজকুমার······

এমন সময় হঠাৎ জান্‌লা দিয়ে একখানা চিঠি ঠাকুরদার কাছে এসে পড়লো। ঠাকুরদা আচম্‌কা চম্‌কে উঠলেন। চিঠিখানা পড়ে ঠাকুরদার খুব রাগ হলো। চিঠিখানায় লেখা ছিল :—

"আমি বিখ্যাত ডাকাত কালী সর্দ্দার। আমি পত্র দ্বারা এই বাড়ীর মালিক শ্রীরামকান্ত রায়কে জানাইতেছি যে তিনি যেন আজ রাত বারোটার সময় অন্ততঃ পঁচিশটী টাকা সেনেদের পুকুরের উত্তর পারের বটগাছটীর নীচে রাখিয়া আসেন। পুলিশ কিম্বা অন্য কোনো লোককে এই সংবাদ জানানো নিষেধ। এই আদেশের কোনরূপ অন্যথা করিলে সমুচিত শাস্তি পাইতে হইবে। ইতি—

—কালী সর্দ্দার।"

রামকান্তবাবু ওরফে ঠাকুরদা চিঠিখানা পীণ্টুর হাতে দিয়ে বললেন—'কি করা যায় বল্‌তো পীণ্টু!'

পীণ্টু বললে—কালী সর্দ্দার যখন চিঠি দিয়েছে তখন পঁচিশটে টাকা রেখে আসুন গিয়ে ঠাকুরদা। না হলে মুস্কিলে পড়তে হবে কিন্তু। যে ডাকাতের উৎপাত হচ্ছে আজকাল এই গাঁয়ে।

ঠাকুরদা পীণ্টুর বন্ধুকে চিঠি দিয়ে দৌড়ে যেতে দেখেছিলেন। পীণ্টু হাসি চাপতে না পেরে খুক্ খুক্ করে কাশতে কাশতে পাশের ঘরে চলে গেল। সে কিন্তু বুঝতে পারে নাই যে ঠাকুরদা তার বন্ধুকে দেখতে পেয়েছিলেন।

* * *

ঠাকুরদা চিঠিটাকে সত্যি বলে ভেবে ভয় পেলেন মনে করে পীণ্টু সবকথা খুলে তাঁকে বললো তখন ঠাকুরদা আর হাসি থামাতে পারেন না—বললেন, বটে এই সব ফন্দি করে টাকা বার করা না? আচ্ছা, যা, টাকা দিয়ে দেব অখন। দুষ্টামির জন্য রাগ করে যে তোকে শাস্তি দিলাম না—এ তোর ভাগ্য।

ঠাকুরদা তাকে পিক্‌নিকের জন্য দশ টাকা দিলেন।

রাত্রে টাকাগুলো খুব যত্ন করে রেখে পীণ্টু শুয়ে পড়ল। কিন্তু তার ভাল ঘুম হোলো না। ভোর হতেই সে টাকাগুলো নিয়ে ছুটলো নন্তুদের বাড়ী। নন্তু শুধালো 'পেয়েছিস?'

—'হ্যাঁ, এই নে।'—পীনটু টাকাগুলো বের করে নন্‌তুর হাতে দিয়ে দিলে।

পীনটু শুধালে, কি রকম প্ল্যানখানা পাকিয়ে ঠাকুরদার কাছ থেকে টাকা আদায় করেছি, বল দিকিনি?

নন্‌তু বললে—'চমৎকার।'

* * *

পিক্‌নিকে তোজটা কি রকম হয়েছিল তা বোধ হয় তোমরা বুঝতে পেরেছ। খাবারের গন্ধটা তো এখনও আমার নাকে ভেসে আসছে। তোমাদেরও জিভে জল এসে গিয়েছে নিশ্চয়।

মৈথিলী মিলন

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বার-এট-ল

চতুর্থ দৃশ্য

[সার্গরব জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে এক মোটা লাঠির উপর ভর দিয়া চুপি চুপি খাদ্যান্বেষণে বাহির হইতেছে। দ্বারদেশে সীতা দেবী তাহার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইলেন]

সীতা। সার্গরব, একি? তুমি শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছ? জ্বর গায়ে কোথায় যাইতেছ? শয্যায় যাও।

সার্গরব। মা, তাত মহর্ষি বাল্মিকী আমারই উপর আশ্রমের ভার অর্পণ করিয়া তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। আমার আকস্মিক পীড়াতে মা তুমি ও তোমার শিশু দুটি কি সঙ্কটে না পড়িয়াছ। অনশনে কোন প্রকারে দিন কাটাইতেছে। আমি এ দৃশ্য আর চক্ষে দেখিতে পারি না।

(সীতার পা জড়াইয়া) মা, আমায় যেতে

দাও, যেতে দাও। আশ্রমে খাদ্য নাই। অনাহারে তোমার শরীর কি কৃশ হইয়াছে। লব কুশের দশাই বা কি হইবে। মা, তোমার আশীর্ব্বাদে কিছু না কিছু জোগাড় করিতে পারিবই।

এই বলিয়া সার্গরব সীতা দেবীর নিবারণ সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল। সীতা দেবী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিয়া স্বকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

[অরণ্য পথ—আশ্রমের এক মৃগ দ্রুতবেগে আশ্রমের দিকে ছুটিতেছে। পশ্চাতে স্বর্ণমুকুটধারী জনৈক নৃপ—শিকারী ধনুর্ব্বাণ উত্তোলন করিয়া অশ্বারোহণে ধাবন করিতেছেন। সার্গরব টলিতে টলিতে লগুড় হস্তে অগ্রসর হইয়া তাঁহার পথ অবরোধ করিল]

সার্গরব (শিকারীর প্রতি) কে তুমি। দাঁড়াও। ফেলো ধনুর্ব্বাণ। তুমি স্বর্ণ মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া গর্ব্বে বেড়াইতেছ আর শত শত অনাথ শিশুরা অনশনে মরিতেছে। ধিক্ তোমায়। এই স্বর্ণ মুকুটের মূল্যে কত অসহায় দীন হীনজন দিনান্তেও এক মুঠা অন্ন পাইতে পারে। ধিক্ ধিক্। শত ধিক্! যা তোর স্বর্ণ মুকুট লয়ে কিন্তু দে, দে, একটি ক্ষুদ্র মুদ্রা—নতুবা এই লগুড়াঘাতে তোর প্রাণ বিনষ্ট করিব। (লগুড় উত্তোলন)।

শিকারী। (অশ্বকে পশ্চাতে হঠাইয়া)—তুমি দস্যু? তবে কি আমি দস্যুর আড্ডায় আসিয়া পড়িয়াছি? আমি রাজা। শিকারই রাজাদিগের চিত্তবিনোদনের এক প্রধান উপায়। রাজকার্য্যে ঔদাসিন্য দেখিয়া আমাত্যবর্গ আমাকে এই অরণ্যে শিকারে পাঠাইয়াছেন। একটি মৃগের পশ্চাতে ধাবণ করিতে করিতে দলচ্যুত হইয়া যাই। শেষে কি মরিতে এই ডাকাতের আড্ডায় আসিয়া পড়িলাম?

(একটি স্বর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া) এই স্বর্ণ মুদ্রাটি এক্ষণে আমার নিকটে আছে—তুমি মুদ্রাটি গ্রহণ কর আর আমার পথ ছাড়িয়া দাও।

(সার্গরব কম্পিত হস্তে মুদ্রাটি গ্রহণ করিল এবং অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্য পথে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।)

(সার্গরব ও মৃগশিকারীর প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

[সার্গরব আশ্রমের সন্নিকটে একটি বৃক্ষের আড়ালে নির্জ্জনে বসিয়া আত্মগ্লানি করিতেছে]

সার্গরব। (আত্মমনে—বুকে হাত দিয়া) ও! আমার হৃদয় কি অস্বাভাবিক ভাবে স্পন্দন করিতেছে। ও! বুকটা কি ভীষণ ভাবে নিপীড়িত হইতেছে। সার্গরব, তোমার বিবেক অতি প্রখর। উহাকে শান্ত কর। শান্ত কর। অন্য অবস্থায় যাহা করিয়াছ তাহা দূষনীয় হইত। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য সৎ—সীতা দেবীর অবস্থা সঙ্কট—তথাপি মন বলিতেছে, এ কাজ ভাল করনি। তুমি দোষ করিয়াছ!

(স্বর্ণ মুদ্রাটি বাহির করিয়া) ও! ইহা দস্যু বৃত্তির দ্বারা উপার্জ্জিত। এই আমার প্রথম দোষ। এই আমার শেষ দোষ। একমাত্র সীতা দেবী ও তাঁহার অপোগণ্ড শিশু দুটির দুঃখ মোচন করিবার উদ্দেশেই স্বর্ণ মুকুটধারী নৃপ-শিকারীর নিকট হইতে ভীতি প্রদর্শন দ্বারা এ মুদ্রা অধিকার করিয়াছি। তাঁহার অর্থের অভাব কি? এক স্বর্ণ মুদ্রা তাঁহার নিকট এক কপর্দ্দক মাত্র।

সীতা দেবীকে কি বলিব? মিথ্যা জিহ্বায় আটকাইয়া যাইবে।

সপ্তম দৃশ্য

[কুশের সহিত লবের আশ্রমে প্রবেশ]

লব। (দৌড়াইয়া সীতার নিকট গিয়া) মা, মা, আমি দুটি ফল পেয়েছি।

সীতা। পেয়েছ বাছা? বাঁচলাম। (ঊর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন করিয়া) ভগবান! তুমি ধন্য! তুমি ধন্য! (পুত্রের প্রতি) কোথায় পেলে বাছা?

লব। আমি ওই পাহাড়ের এগাছের তলায় ওগাছের তলায় ফল অন্বেষণ করছিলাম কিন্তু কোথাও কোন ফল পেলাম না। গাছের ডালে ডালে শীতেতে জড়সড় হইয়া পাখীরা অনাহারে বসে কি চীৎকার করিতেছে! আহা পাখীদের কষ্ট দেখে আমার বড্ড কষ্ট হলো।

আমি নিরাশ হয়ে আশ্রমে ফিরিতেছি এমন সময়ে একজন বৃদ্ধা আমায় ডাকিয়া বলিলেন, —বাবা! তুমি কি গাছের তলায় তলায় ফল খুঁজিতেছ? এই শীতেতে ফল কোথায় বাছা? তবে দেখ, ঔই গাছের তলায় কিছু পাও কি না।

আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া সেই গাছের তলায় গেলুম। দেখি সত্যই দুটি টুক্‌টুকে লাল ফল পড়ে আছে। (ফল দুটি টুকরীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া) এই দেখ মা, কেমন সুন্দর লাল টুকটুকে ফল! ফিরে এসে বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ দিতে গেলাম কিন্তু তাঁর দেখা পেলাম না। মনে হলো তিনি কোন বনদেবী।

সীতা। (তপোবনের বৃক্ষগণের প্রতি শির অবনত করিয়া) তপোবনের পাদপ বাসিনী বনদেবিগণ! অভাগিনী সীতার নমস্কার গ্রহণ কর! তোমাদের কৃপাদৃষ্টি আমার অনাথ শিশু দুটির উপর পতিত হইয়াছে, এজন্য আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর।

অষ্টম দৃশ্য

সীতা। বাবা লব। তুমি কি তোমার রুটিটা খেয়েছ?

লব। মা; রাগ করবেন না। আমি রুটিটা একটা গাছের ডালে কাপড়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে ফল খুঁজছিলাম। কোথা থেকে একটা বাঁদর এসে রুটিটা নিয়ে পালালো। আমিও পিছনে দৌড়ালাম—বাঁদরটা দাঁত বার করে "হুয়াক, হুয়াক" করতে করতে এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফাইতে লাগিল—আমার বেশ আমোদ হলো।

নবম দৃশ্য

সীতা। (লবের প্রতি) দেখতো, তোমার সার্গরবদা আসছেন কি না? বারণ সত্ত্বেও জ্বর গায়ে ফলমূল অন্বেষণ করিতে বাহির হইয়াছেন—বেচারার জন্য আমি বড়ই ভাবিত আছি। (কুশের প্রতি চাহিয়া) কুশ! তুমিও যাও দাদার সঙ্গে তাঁকে খুঁজতে।

লব। আচ্ছা মা, আমি এক্ষণি তাঁহাকে খুঁজে আনছি। কুশ তুমিও এস।

(কুশের সহিত লবের প্রস্থান)

দশম দৃশ্য

[লবকুশ আশ্রমের এক বৃক্ষের অন্তরালে সার্গরবকে দেখিতে পাইয়া দৌড়াইয়া তাহার নিকট গেল]

লব। এই যে সার্গরব দা! তুমি এখানে বসে? ক্লান্ত হয়েছ তাই কি গাছের ছায়ায় বসেছ, না?

কুশ। সার্গরব দা! আমাদের সঙ্গে এস মার কাছে। মা তোমার জন্য ভারি ভাবছেন।

লব। (সার্গরবকে নাড়া দিয়া) সার্গরবদা!

সার্গরবদা! আজ তোমার মন বড় খারাপ দেখছি। মুখে একটি কথা নাই।

কুশ। তুমি অনেকক্ষণ ফলমূল অন্বেষণ করেছ- না?

সার্গরব। হাঁ জঙ্গলে গিছলাম।

লব। তুমি কি কিছু এনেছ?

সার্গরবদা হাঁ, হাঁ, অনেক দিন চলবে।

কুশ। তুমি ত খুব ভাল সার্গরব দা। আমি বনে বনে ফল খুঁজছিলাম কিন্তু একটিও পাইনি। দাদাকে এক বনদেবী দুটি টুক্‌টুকে লাল ফল দিয়েছেন।

সার্গরব। তোমরা সাহসী বীর বালক। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

লব। আশ্রমে এক টুকরোও খাবার নাই, মা বললেন। তুমি কিছু আনতে পেরেছ, মা শুনে কতই না খুসী হবেন। এস, মা তোমাকে খুঁজতে আমাদের পাঠিয়েছেন।

সার্গরব। তোমরা যাও। আমি একটু বিশ্রাম করেই যাচ্ছি।

(লব কুশের প্রস্থান)

একাদশ দৃশ্য

[সীতাদেবীকে দেখিয়া সার্গরব মাটির উপর ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

সীতা। এসেছ বৎস সার্গরব? লব কুশ খবর দিল। আমি কতই না ভাবিত হইয়াছিলাম। এই জ্বর গায়ে আমাদের পোড়া উদরের জন্য কতই না ঘুরেছ! আহা ক্লান্ত হয়ে শেষে ঐ গাছের তলায় বসে পড়েছ?

সার্গরব। না মা, না—আমি আমার শিশু ভ্রাতাদের জন্য ক্লান্তিকে ক্লান্তি মনে করি না।

(সীতাদেবীর পদধূলি লইয়া স্বর্ণ মুদ্রাটি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে উত্তোলন করিয়া) মা, মা, এ মুদ্রাটি গ্রহণ করুন

সীতা। (মুদ্রাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) সার্গরব। এ যে সুবর্ণ মুদ্রা! এ মুদ্রায় আশ্রমের দৈন্য কিছুদিন উপশম হইতে পারে বটে—কিন্তু তোমার হাত কাঁপিতেছে কেন? জিহ্বায় জড়তা।

সার্গরব! মা, তুমি ত জান, আমি পীড়িত, পীড়ায় হস্ত ঈষৎ কাম্পত হচ্ছে। ক্লান্তিতেও হইতে পারে। কি জানি, মুদ্রাটি পাইয়া অত্যাধিক আনন্দে হয় তো হাত কাঁপিতেছে। শুষ্ক কণ্ঠতালু—কথা বোধ হয় তাই বাধিতেছে।

দ্বাদশ দৃশ্য

সীতা। সার্গরব! তুমি সত্যবাদী। মিথ্যা কথা কহিতে জান না—সত্য কহ, প্রতারণা করো না—তুমি এ মুদ্রা কোথায় পাইলে?

সার্গরব। (সীতাদেবীর পদালিঙ্গন করিয়া) মা, মা, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। আমি তোমায় প্রতারণা করিব না। প্রতারণা করিলে যাবজ্জীবন প্রতি পল অনুপল বিচ্ছুর দংশনের যন্ত্রণা ভোগ করিব।

সীতা। সত্য কহ—সত্য কহ।

সার্গরব। আমি এক নৃপ-শিকারীর নিকট হইতে এ মুদ্রাটি পাইয়াছি।

সীতা। কি প্রকারে পাইয়াছ? সৎ উপায়ে কি দস্যুবৃত্তি দ্বারা? দস্যুবৃত্তি শব্দের নামে যে চমকিয়া উঠিলে? সার্গরব সত্য কহ, সত্য কহ।

সার্গরব। মা, আমি তোমাকে সমস্ত খুলিয়া বলিতেছি। ফলের অন্বেষণে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া এক শৈলখণ্ডে বিশ্রাম করিতে ছিলাম। অকস্মাৎ একটি সুবর্ণ মুকুটধারী নৃপ-শিকারী আশ্রমের এক মৃগের পশ্চাতে অশ্ব

ধাবিত করিতেছেন। সত্যই মা, আমি দস্যুবৃত্তির দ্বারাই এই মুদ্রাটি হস্তগত করিয়াছি। মা আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। আমি পাপ করিয়াছি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সৎ।

সীতা। আমাদের দৈন্য দশা পাপকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। যাও সার্গরব যাও। যাঁহার এই মুদ্রা তাঁহাকে ফিরাইয়া দাও। না ফিরাইলে আমার মনে শান্তি চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইবে।

সার্গরব। হায়! কি সর্ব্বনাশ! আমি কোথায় আবার তাঁহার দেখা পাইব! দেখি একবার ঐ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে—সুদূর বিস্তৃত দৃষ্টিতে কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় কি না।

মুদ্রাটি একান্তই ফিরিয়া দিতে হইবে?

সীতা। মুদ্রাটি ছুঁইলে আমায় আঙ্গুল ঝলসিয়া যাইবে! ন্যায় অন্যায়ের তর্ক করিও না—যাও, যাও এক্ষণি যাও।

(সার্গরবের প্রস্থান)

ত্রয়োদশ দৃশ্য

[সার্গরবের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে ঘটনাচক্রে পূর্ব্বের নৃপ-শিকারী ক্ষুৎপিপাসায় আক্রান্ত হইয়া অন্য পথে আশ্রমের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন]

লব কুশ। (তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই দৌড়িয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল) আপনি কে?

শিকারী। এ কি আত্ম পরিচয়ের সময়? আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর, পিপাসায়, আমার কণ্ঠ তালু শুষ্ক—যাও কিছু খাদ্য জল দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।

(লব-কুশ দৌড়িয়া মার নিকট গিয়া জল ও বনদেবী দত্ত ফল দুটি চাহিল)

সীতা! জল ও ফল? তোমরাই কি খাবে? না, কারুর জন্য চাইতেছ? দ্বারে কি কোন অতিথি উপস্থিত?

লব। হাঁ, মা।

সীতা। (কুশের প্রতি) কুশ, তুমি যাও। মৃগাজিনে তাঁহাকে বসাও। লব ফল ও জল নিয়ে যাচ্ছে।

(কুশের প্রস্থান)

এক পাত্র জল ও ফল দুটি লবের হস্তে দিয়া করযোড়ে স্বর্গপানে চাহিয়া বলিলেন—ভগবান তুমি ধন্য! তুমি ধন্য! এই দুটি ফল দিয়া আথিত্য ধর্ম্ম পালিত হইল।

(সহসা সীতাদেবীর দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইল) কেন রে দক্ষিণ চক্ষু তুই নাচিতেছিস? কে জানে হয় তো অতিথি বেশে কোন দেবতা আমাদের দৈন্য দূর করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন।

ঔৎসুক্য বশতঃ দরজার ফাঁক হইতে অতিথির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—"ও আর্য্যপুত্র!" বলিয়া চিৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

[নৃপ-শিকারী ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত করিয়া অশ্বে আরোহণ করিতে যাইতেছেন ইত্যবসারে ব্যর্থ মনস্কাম হইয়া সার্গরব আশ্রমে প্রবেশ করিল]

নৃপ শিকারী। (সার্গরবকে দেখিবামাত্র চমকিয়া বলিলেন) ও! আমার প্রাণ লইও না—কি দুর্দ্দৈব! আমি তোমারি ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসিলাম। আমি কি জানিতাম এ ডাকাতের বাড়ী?

সার্গরব। এ ডাকাতের বাড়ী নয়। আমিও ডাকাত নই কিন্তু (লব কুশের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এই অপোগণ্ড শিশু ও ইহাদের

জননীর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কাণ্ডজ্ঞান শূণ্য হইয়া ভীতি প্রদর্শন দ্বারা আপনার নিকট হইতে (মুদ্রাটি বাহির করিয়া) এই মুদ্রা হস্তগত করিয়াছি। আপনার মুদ্রা আপনি গ্রহণ করুন —আমি ক্ষণিক উন্মত্ত অবস্থায় এ কাজ করিয়াছি —আমাকে মার্জ্জনা করুন।

নৃপ শিকারী। (আশ্বস্ত হইয়া) তুমি তবে দস্যু নও? এ ডাকাতের বাড়ী নয়? বাঁচলাম। আমি স্বেচ্ছায় এ মুদ্রাটি তোমার আতিথ্যের জন্য পারিতোষিক দিতেছি। এখন কি লইতে আপত্তি আছে?

সার্গরব। (প্রফুল্লচিত্তে) না, আমার কিছু মাত্র আপত্তি নাই—তবে কি না মা আমায় ফিরাইয়া দিতে পাঠাইয়াছিলেন—তাঁহাকে এক বার জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি ইহা গ্রহণ করিতে পারি না। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

এই বলিয়া সার্গরব প্রফুল্ল বদনে সীতাদেবীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন—সীতাদেবী ভূশায়িনী-- মূর্চ্ছাপন্না।

পঞ্চদশ দৃশ্য

সার্গরব। (চিৎকার করিয়া) লব কুশ শীঘ্র এস।

লব কুশ। (এক সঙ্গে) কেন ডাকছ সার্গরবদা?

সার্গরব। শীঘ্র এসো! শীঘ্র এসো! তোমাদের মা মাটিতে মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িয়া আছেন। শীঘ্র জল আনো, বাতাস কর। হায় দাশরথি। দেখ, তোমার মহিষী আজ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। জননীর সহিত তাঁহার দুটি শিশুও উপবাস করিতেছে।

নৃপ শিকারী। (সার্গরবের বিলাপধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া আত্মমনে বলিলেন) একি তবে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম? এই দুইটি শিশু কি আমারই পুত্র? হায়, ইক্ষাকুকুলের মহিষী জনক নন্দিনী আজ অনাহারে মূর্চ্ছাপন্না! ধিক্ শত ধিক আমায়! সার্গরব তুমি ঠিকই বলিয়াছ। এ স্বর্ণ মুকুটের মূল্যে কত অনাথ শিশুর জীবন রক্ষা হইতে পারে।

তিনি মস্তক হইতে মুকুট খুলিয়া সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া লবকুশের পশ্চাতে পশ্চাতে সীতাদেবীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন "হা সীতা!" বলিয়াই তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

সার্গরব অবাক—(আত্মমনে) "ইনিই ইনিই কি অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র! দেবীর সম্বন্ধে আমার ধর্ম্ম পিতা! অহো, আমি ইঁহার নিকট হইতে দস্যুবৃত্তির দ্বারা মুদ্রাটি গ্রহণ করিয়াছি! ছি! ছি! কি কুকর্ম্মই না করিয়াছি! অহো! লব কুশের মুখের সহিত ইহাঁর মুখের কি আশ্চর্য্য মিল। আমি চক্ষুর সম্মুখে কি দৃশ্য দেখিতেছি! একি ভ্রান্তি! একি মায়া! একি জাগ্রত স্বপ্ন? ধন্য ভগবান। তোমার মহিমা কে বুঝিতে পারে?

[যবনিকা পতন]

তুষার যুগ

শ্রীবেলা দত্ত

প্রতি বৎসরই আমরা শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সমাগমে বলিয়া থাকি "উঃ কি ঠাণ্ডা, কি গরম, কি বৃষ্টি", কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতি বৎসরই ঋতুর উগ্রতা মোটামুটি সমান থাকে। তবে যুগযুগান্তর পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে পৃথিবীর আবহাওয়া চিরকাল সমভাবে

যায় নাই, যুগ বিশেষে বিভিন্নভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—কখন বা আর্দ্রতা, কখন বা তাপ, কখন বা হিমের প্রাধান্য ছিল যে যুগে শৈত্য প্রাধান্য লাভ করিল সেই যুগকে বৈজ্ঞানিকগণ তুষার যুগ বলিয়া বর্ণনা করেন এবং সেই যুগের কথা এখানে কিছু বলিব।

তুষার যুগ বলিতে সাধারণতঃ মনে হয় এমন একটি যুগ যখন এক কালে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তুষারপাত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে তুষারময় করিয়া তোলে। বাস্তবিক কিন্তু তুষারপাত এক বর্ষণে শেষ হয় নাই। ৫৩০,০০০ খৃষ্টপূর্ব্বে তুষারপাত প্রথম আরম্ভ হয়, পরে বিরাম আসে, পুনরায় তুষারপাত হয়, আবার বিরাম আসে—এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে চারিবার তুষারপাত হয় এবং তাহার মধ্যে তিনবার বিরাম আসে। কিন্তু দ্বিতীয় তুষারপাতের পর যে বিরাম ঘটে সেটি অধিককাল ব্যাপিয়া থাকে। সেই জন্য তুষার যুগকে মূখ্যতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম সবিরাম দুই তুষারপাতকে প্রথম ভাগ বলা যাইতে পারে। ইহা এক লক্ষ ষাট হাজার বৎসর স্থায়ী ছিল। পরে দীর্ঘকাল ব্যাপী বিরামকে দ্বিতীয় ভাগে ফেলা যাইতে পারে, ইহা আড়াই লক্ষ বৎসরকাল স্থায়ী। আরো পরে সবিরাম তৃতীয় ও চতুর্থ তুষারপাতকে তৃতীয় ভাগে ফেলা যাইতে পারে। ইহা এক লক্ষ দশ হাজার বৎসর কাল ব্যাপিয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে তুষার যুগ মোট পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার বৎসরকাল স্থায়ী ছিল। এই যুগের অবসানও আকস্মিক হয় নাই, অবসান ঘটিতে তের হাজার বৎসর লাগে। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া শীত গ্রীষ্মের ভীষণ সংগ্রাম চলিতে থাকে। অবশেষে খৃঃ পূঃ ৫০০০ সালে গ্রীষ্মই পূর্ণ জয়লাভ করে।

এক্ষণে দেখা যাক এই যুগে পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ ছিল। তুষারযুগে প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগের অপেক্ষা অধিক শীতল ছিল। এই সময়ে উত্তরমেরু হইতে আল্পস্ পর্ব্বতের এক ক্রোশ উত্তর পর্য্যন্ত তুষাররাশি বিস্তার লাভ করে এবং পূর্ব্বদিকে উইরাল পর্ব্বত হইতে পশ্চিমে টেমস্ নদী পর্য্যন্ত ব্যাপৃত থাকে। তুষারপাতে অনেক হ্রদের সৃষ্টি হয়। সুইট্‌জারল্যাণ্ড, উত্তর ইটালি, ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও উত্তর আমেরিকার হ্রদ সমূহ এই প্রথম তুষারপাতেরই দান।

দ্বিতীয় বিরামকালে, অর্থাৎ যেটি আড়াই লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া চলে, তাপের বৃদ্ধি হইল এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে যেরূপ আবহাওয়া দেখা যায় তখন উত্তর অঞ্চল ইহা অপেক্ষা উষ্ণ ব্যতীত পীতল ছিল না। তখন আমেরিকা ও ইউরোপে প্রচুর উদ্ভিদ দেখা দিয়াছিল এবং হাতী, বাঘ, সিংহ, হরিণ প্রভৃতি গ্রীষ্ম প্রধান দেশের জীব-জন্তুর মত নানাবিধ প্রাণী সেখানে দেখা গিয়াছিল। শীতপ্রিয় ম্যামথ হস্তী বা বল্‌গা হরিণ তখন ইউরোপের সুদূর উত্তরপ্রান্তে নরওয়ে ও সুইডেন অঞ্চলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

এই আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভৌগলিক পরিবর্ত্তনও যথেষ্ট ঘটিয়াছিল। সেগুলি আমাদের পক্ষে এমন কি ধারণা করাও কঠিন। মানচিত্রে আজ আমরা বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে সীমানা দেখি তুষার যুগে সেই সীমানাগুলি বিভিন্ন ছিল এবং সেই যুগের মধ্যেও তাহাদের বারংবার পরিবর্ত্তন ঘটে। তবে মোটামুটি বলা যাইতে পারে তুষারপাতের সময় ভূপৃষ্ঠ স্থানে স্থানে উঁচু হয় আবার বিরামের সময় উহারা নীচে বসিয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে প্রত্যেক তুষারপাতের সময় সেই যুগে জিব্রাল্টার

প্রণালী বারবার উঁচু হইয়া স্পেন ও আফ্রিকার সহিত স্থল সংযোগ করিয়া দিত। ইটালি ও সিসিলি এইরূপে স্থল সংবদ্ধ হইয়া আফ্রিকার সহিত যুক্ত হইয়া যাইত। আবার এসিয়া মাইনর ও বল্‌কান্ উপদ্বীপের সহিত স্থলযুক্ত হইয়া পড়িত। এই নূতন যোজকগুলি বিরামকালে পুনরায় অতল জলে নিমজ্জিত হইয়া পড়িত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে একা ভূমধ্য-সাগরেই তিনটি বিভিন্ন স্থানে তুষারপাত ও বিরামের সঙ্গে সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের উঠানামা চলিত। সাহারা মরুর উত্তর অঞ্চল এই যুগে নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ ছিল। এই দেশটি তখন উর্ব্বর ও শ্যামল ছিল। সাহারার দক্ষিণ হইতে তখন গ্রীষ্মমণ্ডল আরম্ভ হইত।

ভাল করিয়া দেখিলে আজও সেই যুগের কতকগুলি চিহ্ন দেখিতে পাই। তুষারের ঘর্ষণে ইউরোপ মহাদেশের উত্তরাংশের অধিকাংশ স্থল-ভূমি মসৃণ হইয়া গিয়াছে, পাহাড়ের চূড়াগুলিও কর্কশতা হারাইয়া যেন কোন এক পাথরের সমুদ্রের তরঙ্গের মত দেখাইতেছে। আবার স্থানে স্থানে এমন কি তুষার প্রবাহের গতিরেখাগুলি সুস্পষ্ট আঁকা রহিয়াছে। এই প্রবাহের বেগে অনেকগুলি প্রস্তরখণ্ড নিজের স্থান হইতে দেশান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। রুশিয়ার কতগুলি প্রস্তর হল্যাণ্ডে আসিয়াছে আবার সুইডেনের কতকগুলি প্রস্তর ডেন্‌মার্কে দেখা যায়।

এত বড় বড় পাথর এইভাবে স্থানান্তরিত হওয়া আদৌ বিস্ময়কর নহে, কারণ প্রবাহকালে কি ভীষণ তুষাররাশি একত্রে আসিত তাহা এক প্রকার কল্পনাতীত। এক সমতল ক্ষেত্রেই চারি হইতে পাঁচ হাজার হাত উচ্চ বরফ জমা থাকিত আর আল্পস্ বা পিরিনিস্ পাহাড়ের চূড়ায় যে কি পরিমাণে বরফ জমা থাকিত তাহার ইয়ত্তা নাই। একদিন এইভাবে সমগ্র ইউরোপে ১১ লক্ষ বর্গ মাইল তুষারে আচ্ছাদিত ছিল।

এখন উত্তর মেরুর অঞ্চলে যেরূপ উদ্ভিদাদি দেখা যায়, তুষারপাতের সময় ইউরোপে স্পেন পর্য্যন্ত সেই শ্রেণীর উদ্ভিদাদি দেখা যাইত। ক্রমশঃ শীত কমাতে দক্ষিণ ইউরোপের সমতল ভূমিতে পুনরায় আগেকার যুগের গাছপালা দেখা দিল। এই স্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে কিন্তু অদ্যাপি মেরুদেশীয় উদ্ভিদাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

তুষারযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জীবগণ দক্ষিণ হইতে উত্তরে অভিযান করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হঠাৎ হয় নাই, অন্ততঃপক্ষে তের হাজার বৎসর ব্যাপিয়া লাগে। সেই জন্য প্রথম প্রথম জীবেরা মাত্র গ্রীষ্মকালে উত্তর অঞ্চলে যাইত আবার শীতের পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিত। কিছু কাল এইভাবে যাতায়াত করিবার পর উত্তর প্রদেশগুলি নাতিশীতোষ্ণ অবস্থায় আসিলে জীবগণ তথায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিল।

আজ ৭০০০ বৎসর হইল তুষার যুগ শেষ হইয়াছে এবং যদিও এখন আল্পস্ ও পিরিনিস্ পর্ব্বত এবং মেরুদেশ চির তুষারাচ্ছন্ন তথাপি আমরা ভাবিতেছি যে এখন হইতে পৃথিবীর তাপ ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকিবে। আমরা ভুলিয়া যাই যে সৃষ্টির ইতিহাসে ৭০০০ বৎসর অতি নগণ্য। সুতরাং কে বলিতে পারে যে পরে একটি তুষার যুগ আসিবে না এবং এখন যে যুগটি চলিতেছে সেটি বিরামযুগ নহে।

সবার আগে আত্মসম্মান

লেডী মৃণালিনী রায় স্কুলটি দেখে যাবার দুই দিন পরে আজ বিখ্যাত ডাক্তার শীতাংশু নাথ মুখোপাধ্যায় স্বাস্থ্য ও মানুষের দেহ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন। লেডী রায় বাল্যকালে এই স্কুলেই পড়েছিলেন। হাইজিন বা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান লেডী রায়ের প্রিয় পাঠ্য বিষয় ছিল। তিনি সে-দিন বলে গেছেন "মানুষের দেহের গঠন" সম্বন্ধে যে সব চেয়ে ভাল প্রবন্ধ লিখতে পারবে তাকে খুব দামী একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। নীচের ক্লাস ও উপরের ক্লাসের মেয়েরা সকলেই এ পরীক্ষা দিতে পারবে। নীচু ক্লাসের মেয়ে যদি সেই ক্লাসের উপযোগী করে লেখে ও উপরের ক্লাসের মেয়ের চেয়ে বেশী নম্বর পায় তবে সেইই পুরস্কার পাবে।

রমা ও শীলা দুই বন্ধু। কোন বিষয়ে মুস্কিলে পড়লেই পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতো। যে অঙ্কটা কঠিন, শীলা পারত না, রমা তখন তাকে বলে দিত। রমা ও শীলা স্কুলে সব সময়ে এক সঙ্গে থাকতো। শীলা তার সব কথা রমাকে বলতো, রমা তার মনের সব কথা শীলাকে বলত। তাদের এত ভাব দেখে অন্যান্য মেয়েরা তাদের শ্যামদেশের যমজ বলে ঠাট্টা করতো।

সেদিন স্বাস্থ্যের বক্তৃতা শোনবার জন্য হল ঘরে সব মেয়েরা বসেছে। রমা তার খাতাখানি হাঁটুর উপর রেখেছে নোট লেখবার জন্য আর শীলাও তাই করেছে। সে ঘরে ত ডেস্ক নাই যে তার উপর খাতা রাখবে। হাঁটুর উপর খাতা রেখে লেখা বড় মুস্কিল। রমা পেন্সিল দিয়ে যে নোট লিখল তা পরিষ্কার হলো না, সবই যেন অর্থহীন ও জড়িয়ে গেল। সে ভাবল শেষে এর থেকে মানে বার করবে কি করে?

তারা দুজনে স্কুল থেকে বার হলো। গেটে যেতে যেতে শীলা হেসে বলল, শীতাংশু বাবু বেশ সুন্দর বললেন কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে সব কথা মনে নাই।" তাদের বাড়ী কাছে বলে তারা হেঁটেই স্কুলে যাতায়াত করতো।

শীলা ও রমা যখন স্কুল থেকে বার হলো তখন সব মেয়েরাই চলে গেছে। তাদের স্কুলে স্পোর্টস্ হবে সেজন্য তারা শুধু ঠিক করছিল সেদিন কি কি হবে। শিক্ষয়িত্রীরা তাদের উপর আয়োজনের ভার দিয়েছিলেন কারণ তারা পড়া-শুনাতে যেমন খেলা-ধূলাতেও খুব ভাল ছিল।

রমা বলল, ওঁর বক্তৃতা থেকে যা দরকারী সব টুকেছি কিন্তু কি যে মাথামুণ্ডু লিখেছি পড়তেই পারছি না।

রমার খুব ইচ্ছা যে সে এই বিশেষ পুরস্কারটা পায়।

শীলা বলল, আমিও তো নোট নিয়েছি কিন্তু কি মুস্কিল আমার নোট এত খারাপ হয়। যেগুলি দরকার সেগুলিই ছেড়ে যাই। ও রমা, রাস্তায় এটা কি পড়ে আছে?

এই বলে সে রাস্তার পাশে কাগজের তাড়ার দিকে দেখালো।

রমা দৌড়ে গিয়ে সুতা দিয়ে বাঁধা কাগজের তাড়াটি তুলে নিল।

রমা বলল, "ও! কেহ হয়ত নোটের তাড়া ফেলে গেছে। এই বলে সে স্টো শীলার হাতে দিয়ে চারিদিকে দেখতে লাগলো। এই কাগজের তাড়ার মালিককে কোথাও দেখা যায় কি না।

কত লোক এ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। তখন রাস্তায় আর কাহাকেও দেখা গেল না।

শীলা কাগজের তাড়াটা খুলে দেখলো—দেহের গঠনের কথা লেখা ও কত ছবি আঁকা রয়েছে। তখন সে বলল, রমা, এই সব নোট দেখে আমরা বেশ ভাল করে রচনাটা লিখতে পারবো।

রমা চমকে উঠে বলল, কক্ষনো না, সে ত ঠিক কাজ হবে না।

শীলা হঠাৎ রেগে গিয়ে বললো, ওহো, ঠিক কাজ হবে না! কেন বই পড়েও তো আমরা লিখি আর এই নোট থেকে যদি আমরা লিখি তবে অন্যায় হবে কেন? আমরা বক্তৃতা তো বসে বসে শুনেছি।

রমা বলল, না, অন্যায় হবে বই কি? অন্যের লেখা নোট ব্যবহার করব কি করে? সে বেচারার পুরস্কার পাবার সুযোগটা কেড়ে নেব!

শীলা বলল, ও হো! তার তবে সাবধান হওয়া উচিত ছিল—রাস্তায় এমন করে নোট লেখা ফেলে যেতে হয়? এত অসাবধান।

রমা বললো; আ! সে কি ইচ্ছা করে ফেলেছে? হঠাৎ তার অজানিতে এটা পড়ে গেছে—সে টেরও পায় নাই। এমন কি আর হয় না! বা! এটা স্কুলে নিয়ে চল, যার নোট তাকে কাল ফিরিয়ে দেওয়া যাবে।

শীলা বলল, না, আমি তা করব না। দেখ না, শরীরের অংশগুলি কি সুন্দর করে আঁকা। উঁচু ক্লাশের কোন মেয়ে বোধ হয় তার নোটটি হারিয়েছে। যখন সে টের পাবে যে অমন সুন্দর নোটটি হারিয়ে ফেলেছে তখন সে কি মুস্কিলে পড়বে।

রমা ধীরে ধীরে বলল, এগুলি ফিরিয়ে দাও। তার কথায় তেমন জোর ছিল না। তার ন্যায় অন্যায়ের জ্ঞান যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছিল। তারপরে হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো তার খাতাগুলির উপর। সে খাতাগুলিতে তাদের স্কুলের নাম ও মটো ছাপানো। মটো হলো—সবার আগে আত্ম সম্মান।

শীলা বলল, আমি এগুলি ফিরিয়ে দিচ্ছি আর কি!

সে নোটগুলি ব্যাগের মধ্যে পুরে নিলো।

শীলা বলল, আমি এই নোট থেকেই লিখব। আমার হয়ে গেলে তুমি নিও।

রমা বলল, আমার ও-নোটের দরকার নাই। এই বলেই তার বাড়ীর কাছে আসাতে সে চলে গেল।

সব সময়েই কিন্তু তার ঐ নোটের কথাই মনে হচ্ছিল। শীলা ওটা প্রথমে দেখেছে কিন্তু সে ওটা রাস্তা থেকে তুলেছে কাজেই নোটটা তারই লওয়া উচিত ছিল কিন্তু শীলা যে সব বিষয়েই কর্তৃত্ব করে!

স্কুলের পড়া শেষ করে রমা দেহের গঠন সম্বন্ধে যে নোট লিখেছিল সেগুলি নিয়ে বসলো। কি যে সে লিখেছে বুঝতেই পারছিল না আর সে যা শুনেছিল তা মনেও তেমন যেন পড়ছে না। শীলার হাতে সেই পড়ে পাওয়া নোটের মধ্যে যে শরীরের অংশের ছবি আঁকা দেখেছিল সেগুলি পেলে তার বেশ সুবিধা হতো। যাক্ দেখা যাক্ বন্ধুর কাছ থেকে ওটা চেয়ে নিলেও হবে।

যেমন সে মনে মনে এই ঠিক করলো অমনি তার চোখ আবার খাতার উপরের সেই মটোর উপর পড়লো। তখন তার মনে হলো, অন্যের লেখা নোটের সুবিধা নেওয়া উচিত নয়। যখন আগে থেকে বলেই দেওয়া হয়েছে বক্তৃতা শুনে সকলে নিজে নিজে নোট লিখে নিয়ে তারপর লিখবে।

পরদিন স্কুলে লেডী রায়ের পুরস্কারের বিষয় প্রায় সব সময়ে আলোচনা হচ্ছিল। প্রত্যেকেই ঐ পুরস্কারটি পাবার জন্য চেষ্টা করবে শোনা গেল।

রমার সেদিন স্কুলে যেতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। সে রাস্তায় শীলার জন্য অপেক্ষা করছিল কিন্তু তার দেখা পায় নাই। সে যখন বিদ্যালয়ে এলো তখন ঘণ্টা পড়ে গেছে মেয়েরা প্রার্থনার জন্য হলে একত্র হয়েছে।

উপাসনার পর যখন তারা ক্লাশে যাচ্ছিল তখন রমা শীলাকে বলল, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করলে না কেন?

শীলা বলল, ও! আমি আজ লীলার বাড়ী গিয়েছিলাম। তাই অন্য পথ দিয়ে গিয়েছি।

রমার ইচ্ছা ছিল শীলার কাছ থেকে সেই নোটটা চেয়ে নেয় কিন্তু সুবিধা পেলো না। সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হলো, শীলাকে একলা পেলোই না।

ছুটির পর তার ক্লাশের শিক্ষয়িত্রী নলিনীদি রমাকে ডেকে বললেন, প্রাইজের সময় রমাকে একটা গান করতে হবে আর "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" অভিনয় হবে, তাতেও ক্ষীরির অংশ নিতে হবে। এ কথা শুনে রমার আনন্দ আর ধরে না। সে তখনি দৌড়ে শীলাকে এই খবর দিতে তাদের ক্লাসের দিকে গেল।

শীলাকে কোথাও দেখতে পেলনা। তপতী তাকে বলল, শীলা লীলার সঙ্গে বাড়ী চলে গেছে।

সে তখন মনে মনে দুঃখিত হয়ে বাড়ীর দিকে চললো ভাবলো "কাল তার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে।" তার শীলার সঙ্গে এত ভাব ছিল যে অন্য মেয়েদের সঙ্গে সে বেশী মিশত না কাজেই সঙ্গীহারা হয়ে তার বড়ই খারাপ লাগতে লাগলো।

সন্ধ্যার সময়ে সে পড়তে বসলো। ক্লাশের পড়া শেষ করে পারিতোষিক রচনাটা লিখবে ভাবলো। আজ একটা

খসড়া করে রাখবে, কাল শীলার কাছ থেকে ওই নোটটা নিয়ে সবটা ভাল করে লিখবে।

তাই কি সে করবে? চোখের সামনে আবার খাতার মলাটে তাদের বিদ্যালয়ের মটোর উপর চোখ পড়লো। মটোটা যেন জ্বল জ্বল করতে লাগলো। সে তখনি খাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

সে তারপরে তার নিজের লেখা নোট নিয়ে মনে করে করে লিখতে আরম্ভ করলো। সে যে বক্তৃতা শুনেছিল তা স্পষ্ট এখন মনে আসতে লাগলো। তারপরে সেই নোটে যা লেখা ছিল তা' মনে করে দেখলো, ডাক্তার বাবুর লেক্‌চারের সঙ্গে তা যেন মেলে না। সে ভাবল "বা! এ তো অদ্ভুত দেখছি।"

পরদিন সকালে শীলা হাসতে হাসতে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। দু'জনে মিলে বিদ্যালয়ে চললো। শীলা খুব উৎসাহের সঙ্গে বললো, রচনাটা আমার লেখা শেষ হয়ে গেল। এ লেখাটা পড়ে সকলে ভাববেন, কেমন করে এমন সুন্দর রচনা আমি লিখলাম। সবাই অবাক্ হয়ে যাবেন। তুমি কি ওই নোটটা নেবে? না বিদ্যালয়ের মটো মেনে চলবে?

এই বলে সে আনন্দে লাফাতে বাগলো। তার পা যেন আর মাটীতে পড়ে না।

শেষের কথাটা শীলা এমন ঠাট্টার সুরে বললো যে রমা তখনি ঠিক করলো নোটটা কখন নেবে না। সে হেসে বললো, ও! আমি স্কুলের মটো মেনেই চলবো। মটোর সার্থকতা কি, যদি সেই অনুসারে জীবনটা চালাতে না পারি?

শীলা হেসে বললো, ভাল কথা, তাহলে আমার প্রাইজ পাবার সম্ভাবনা বেশী হবে। আমি খোঁজ নিয়েছিলাম আমাদের ক্লাশের কেহ নোট হারায় নাই। রেবা তার দিদিকে জিজ্ঞাসা করেছিল তাদের ক্লাশেরও কেহ নোট হারায় নাই।

রমা বলল, তবে কি ক্লাশ "এইটের" মেয়েদের মধ্যে কেহ হারালো?

শীলা ঠাট্টা করে বলল, তাদের এত বিদ্যা নাই যে এমন সুন্দর নোট লেখে। আমার মনে হয় যে বক্তাই বোধ হয় নোটটি হারিয়েছেন। অমন চমৎকার নোটের সাহায্য না নিয়ে তুমি খুব বোকামী করলে। তাহলে আমরা দুজনেই প্রাইজ পেতে পারতাম? কেমন আনন্দ হত না!

রমা ধরা গলায় বলল, এবারে তোমাকে একলাই দাঁড়াতে হবে।

সে রাত্রে রমা তার নিজের নোট থেকে অনেক পরিশ্রম করে রচনাটা লিখলো। ওই নোটে যা লেখা ছিল তার সেগুলি কেবল মনে আসতে লাগলো অথচ সে তা ব্যবহার করল না।

পরদিন শীলা তার সঙ্গে কথাই বলল না। লীলার সঙ্গে খুব কথাবার্ত্তা বলছিল আর যখন রমা তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে এমন হাসছিল। তার হাসিবার রকম দেখে রমার শরীর যেন জ্বলে গেল। সে স্কুলের ছুটির পর একলাই বাড়ী চলে গেল। শীলাকে ডাকল না।

রমা সেদিন সন্ধ্যার সময় তার রচনাটা আবার ভাল করে লিখলো। তারপরে বিছানায় শুয়ে পড়লো। শীলা যে তার সঙ্গে কথাই বলে না, তাকে দেখলে ঠাট্টা করে! তার খুব দুঃখ হলো—চোখে জল এলো। চোখের জল শুকাতে না শুকাতে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন তাকে রচনাটা হেড মিস্‌ট্রেসকে দিতে হবে। তার দুই সপ্তাহ পরে ফল জানা যাবে—কে প্রাইজটি পাবে।

শীলা যে তার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না বরং একগুঁয়ে বলে ঠাট্টা করে—এ সব সে ভুলতে চেষ্টা করতো কিন্তু পারত না।

তারপরে সত্যি সত্যিই সেই বিশেষ দিনটি এসে গেল। রচনার পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য সব মেয়েরা হলে একত্র হলো। লেডী রায়ও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি সভানেত্রী হলেন। যে ডাক্তার বাবু বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনিও উপস্থিত ছিলেন। স্কুলটি উৎসবের আনন্দে পূর্ণ।

ডাক্তার বাবুই সভাতে প্রধান বক্তা ছিলেন। তিনি বললেন, সব মেয়েরা যে পুরস্কার পাবার জন্য উৎসাহ দেখিয়েছে তাতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। সকলেই

প্রায় বিষয়টি বেশ বুঝতে পেরেছিল। দুটি মেয়ের লেখা ভাল হয়েছে। একজন ম্যাট্রিক ও আর একজন তৃতীয় শ্রেণীর আর একজনের রচনার বিষয় আমি পরে বলব। যে দুটি মেয়ে পুরস্কার পাবে তাদের নাম—মীরা মৈত্র ও রমা বসু।

সব মেয়েরা তখন করতালি দিয়ে উঠলো। এরূপ অপ্রত্যাশিত আনন্দের সংবাদে রমার মাথা যেন ঘুরে গেল। তার মনে হলো মেয়েরা সব মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও! ম্যাট্রিক ক্লাশের মেয়ের সঙ্গে তার নাম! কি আশ্চর্য্য! মীরা খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে সে প্রতি বারই প্রথম হয়ে ক্লাশে উঠেছে।

তারপরে রমার মাথাটা ঠিক হলে সে আবার ডাক্তার বাবুর বক্তৃতাতে মন দিল।

তিনি বলছেন—একটি রচনার বিষয় না বলে পারছি না। আমি অবশ্য লেখিকার নাম বলব না। এ রচনাটা কাব্য রচনা। আমার এক ছাত্র সে পড়াশুনায় খুব ভাল, বুদ্ধিমান। সে নিজের ইচ্ছানুযায়ী একটা মত ঠিক করে শরীরের গঠন সম্বন্ধে প্রচলিত মতের অন্যরূপ মত অনুসারে এক প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছিল, সেটি আমার কাছে ছিল। আমি সেটা হারিয়ে ফেলেছিলাম। দেখলাম সেই হারানো প্রবন্ধটি অবলম্বন করে একটি মেয়ে সেই অদ্ভুত মত অনুসারে রচনা লিখেছে। সে কিন্তু বোঝে নাই যে মতটা অদ্ভুত, লেখকের কল্পনাজাত। সে আশা করেছিল এই প্রবন্ধ লিখে সে পুরস্কার পাবে। আমি তাকে শুধু একটা কথা বলতে চাই—আবার কোন প্রতিযোগীতায় যোগ দেবার সময় সে যেন স্কুলের মটো "সকলের আগে আত্ম-সম্মান" এই কথাটি মনে করে।

এ কথা শুনে কেহ আর করতালি দিল না। সকলে লজ্জায় চুপ করে রইলো। স্কুলের একজনের নিন্দা শুনে সকলেই ব্যথিত হলো।

তারপরে লেডী রায় ২০৲ টাকা দামের বই দুইজনের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

সকলে যখন বাড়ী ফিরে যাচ্ছে, রমা তখন শীলাকে দূরে একলা যেতে দেখে দৌড়ে তার কাছে গেল।

শীলা তখন কান্নায় যেন ভেঙ্গে পড়ছে—সে বলল, ভাই রমা, তুমি ভাই কাকেও বলো না যে আমি ঐ রচনাটা লিখেছিলাম, তা হলে আমায় কত কটু কথাই সকলে বলবে! আমি স্কুলের নাম খারাপ করলাম!

তার তখন মনে হলো ম্যাট্রিক ক্লাশের মেয়ের সমান নম্বর সে পেয়েছে সেটা খুব গর্ব্বের কথা কিন্তু ক্লাশের সব পরীক্ষায় প্রথম মেয়ে শীলার বন্ধুত্ব রাখা তার কাছে আরও গর্ব্ব ও আনন্দের কথা।

রমা বললো—আমি তোমার নাম বলবো না। আমিও তো তোমার মত কাজই করতাম কেবল রাতদিন যদি স্কুলের মটোটা আমার মনে না জাগতো।

মুকুল সাহিত্য সঙ্ঘ

জন্মদিন

শ্রীঅমল কুমার মিত্র

আজ রমি, তোর জন্ম দিনে
পদ্য লিখছি গোল করিস্ নে,
লক্ষ্মী হয়ে আজকে দিনে
থাকিস্ কেবল খুসী মনে।
কপালেতে চন্দন আর কাজল এঁকে চোখেতে
সাজিয়ে দেব আজকে তোকে
মন-ভোলানো বেশেতে

দুষ্টুমীটা থামাস্ ওরে
শুধু আজকে দিনের তরে,
সবাই তোকে আদর করে
দেবে কত খেলনা যে-রে!
দাদু, দিদি আদর করে
চুমোয় দেবে দু'গাল ভরে,
সেজেগুজে বিকেল বেলা
বাইরে গিয়ে করিস্ খেলা।

বন্ধুরা সব এলে পরে
আনিস্ তাদের দু' হাত ধরে,
বসিয়ে তাদের ঘরের মাঝে
গল্প করিস্ যত আছে।
মিষ্টি মধুর সম্ভাষণে
তুষ্‌বি তাদের আপন গুণে,
ধান দুর্ব্বা দিয়ে মাথায়
করবে আশীষ যখন সবায়।
তখন কিন্তু শান্ত হয়ে
করিস্ প্রণাম সবার পায়ে,

জন্মোৎসব হয়ে গেলে
যখন সবাই যাবে চলে।
মধুর হাসির সঙ্গে তবে
বিদায় জানাস্ তাদের সবে॥

তার পরেতে ঘুমের আগে
জানিয়ে নতি প্রভুর পায়,
বলিস্ "প্রভু, জীবন পথে
তোমার আশীষ্ দিও আমায়।"

শ্রীযতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

লিজি

(রোমীয় উপন্যাস—দ্বিতীয় ভাগ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

একটু পরেই পেত্রোনও ভিনিসিয়াস রাজকীয় ভিলা হইতে বাহির হইল। পথে ভিনিসিয়াস বলিল, "পেত্রোন মুহূর্ত্তের জন্য আমি ভয়ে অস্থির হইয়াছিলাম। তুমি রাজসভায় মৃত্যু লইয়া খেলা কর।"

পেত্রোন হাসিয়া বলিলেন, "ঐ স্থানটাই আমার রঙ্গভূমি। আর আমিত নেহাত কাঁচা পালোয়ান নই। দেখলে ত কি কৌশলে নীরোকে হারাইলাম। আমি ইচ্ছা করলেই টিগেলিনের মুণ্ডপাত করে প্রিটোরিয়া সৈন্যের অধিনায়ক হতে পারতাম। কিন্তু এত কষ্ট করবার দরকার কি? যেমন সহজভাবে জীবন চলছে আমার পক্ষে তাই ভাল।"

পরদিন নীরো সাইপ্রাস সাগরের সম্মানার্থ এক সঙ্গীত রচনা করেন। কথা ও সুর—দুই-ই তাঁহার নিজের। সম্রাট মধুর স্বরে গান গাহিলেন। তিনি অনুভব করিলেন যে তাঁহার সঙ্গীতে শ্রোতরা মুগ্ধ হইয়াছে। এই বিশ্বাস বশতঃ তাঁহার কণ্ঠে এমন এক অপূর্ব্ব মাধুরী ফুটিল যে ভাবের আতিশয্যে নীরো একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি রমণীগণের অভ্যস্ত প্রশংসাবাদে কর্ণপাত করিলেন না। বাদকদিগকে বলিলেন, "আমি ক্লান্ত হয়েছি, আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। ঐক্যতান বাদ্য বন্ধ কর।" তখন নীরো রেশমী গলাবন্ধে গলা জড়াইলেন। গৃহের এক কোণে পেত্রোন ও ভিনিসিয়াস বসিয়াছিলেন তাহাদিগকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা দুজনে আমার সঙ্গে এসো। ভিনিসিয়াস আমায় ধর, আমি দুর্ব্বল বোধ করছি।"

উভয়ে সম্রাটকে ধরিয়া খোলা বারান্দায় মুক্ত বায়ুতে লইয়া গেল।

সম্রাট নীরো তখন বলিলেন, "পেত্রোন, আমাকে যে ভালবাসে তার কাছে আমার হৃদয়ের কবাট খুলতে বাধা কি? তুমি কি মনে কর যে আমি অন্ধ কিম্বা নির্ব্বোধ? রোমে প্রাচীরের গায়ে

গায়ে আমার নামে যে সকল কটূক্তি লিখিত হয় তা কি আমি জানি না? লোকে যে আমাকে মাতৃহন্তারক বলে, স্ত্রী হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে আমি কি তাহা শুনি নাই? আমার দুর্ব্বল চিত্তের সুযোগ লইয়া টিগেলিন কয়েকজন অনিষ্টকারীর প্রাণদণ্ড দিয়াছে। সেই জন্য রোমবাসী আমাকে নিষ্ঠুর "জল্লাদ" নামে অভিহিত করে। আমার নিষ্ঠুরতার কাহিনী রোমবাসিগণ এতই বিশ্বাস করে যে আমি প্রকৃতই নিষ্ঠুর কিনা সে বিষয়ে আমার নিজেরই সন্দেহ হয়। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, সম্রাটের কর্ম্মচারীর কৃতকার্য্যের সহিত তাঁহার যোগ নাই। কেহ ত বিশ্বাস করে না, হয়ত তুমিও বিশ্বাস করবে না, যে সঙ্গীতের আবেশে আমি নিদ্রাতুর শিশুর মত কোমল চিত্ত হই।"

পেত্রোন বলিলেন, "রোমবাসিরা আপনাকে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু যাহারা আপনাকে ভালরূপে জানে আমি তাহাদের মধ্যে একজন।"

সম্রাট তখন ভিনিসিয়াসের বাহুর উপর আরও ভর দিলেন। পরে কাতরকণ্ঠে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন—"টিগেলিন আমাকে বলিয়াছে যে সিনেট সভার সভ্যগণের ধারণা যে দিওদার ও তারপেনোস সেতার বাদ্যে আমার অপেক্ষা দক্ষ। তোমার কি মত তা খুলে বল। তাহারা কি প্রকৃতই আমার চেয়ে ভাল বাজাতে পারে, অথবা আমার মতই সেতার বাজাতে পটু?"

পেত্রোন উত্তর দিলেন, "না, না, সেতারে আপনার হাতই বেশী দক্ষ। আপনার বাদ্য অধিক উন্মাদক। তাহারা বাদ্যযন্ত্রে ওস্তাদ কিন্তু আপনি সঙ্গীত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। আপনার গুণপণা বুঝিতে হইলে, তাহাদের বাজনা শুনিতে হয়।"

নীরো কহিলেন, "তোমার কথায় তাহাদিগকে মার্জ্জনা করিলাম। তাহারা জানিতে পারিবে যে পেত্রোনই তাহাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছে। তাহাদিগকে বধ করিলে আবার তাহাদের স্থান ত পূরণ করিতে হইবে?

পেত্রোন—"কি আশ্চর্য্য কথা যে সঙ্গীতের প্রতি একান্ত সমাদর বশতঃ আপনি রোমে সঙ্গীতজ্ঞের মূলোচ্ছেদ করিতে চাহেন। শিল্পকলার উন্নতির নিমিত্ত কখনও শিল্পের মূলে আঘাত করিবেন না।"

নীরো বলিলেন, "আহা, তোমাতে ও টিগেলিনে কত প্রভেদ! তুমি হয়ত জান আমাতে দুইজন নীরো আছে। লোকে যে সম্রাটকে জানে সে একজন। আর একজন কেবল একমাত্র শিল্পকলার উপাসক। শেষোক্ত নীরো "বেকাসের" মত মত্ত, মৃত্যুর মত সংহারক,—কেননা সে কুৎসিতকে ঘৃণা করে এবং মরণোন্মুখকে অসম্মান করে। জীবনে যখন শিল্পকলার প্রতি আদর থাকিবে না তখন আমার জীবন কত নিষ্ফল হইবে, আমার পক্ষে রাজ্যভার কত গুরু হইবে।

পেত্রোন সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"সম্রাট, আমি আপনার দুঃখভাগী, জলস্থল আমার সঙ্গে আপনার দুঃখে আক্ষেপই করে। ভিনিসিয়াসও আপনাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে।"

নীরো প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন, "যদিও ভিসিসিয়াস রণ-দেবতার ভক্ত, সরস্বতীর উপাসক নয়, তবুও সে, তোমার মতই, আমার প্রিয়পাত্র।

এই সুযোগে পেত্রোন তাহার ভ্রাতষ্পুত্র ভিনিসিয়াসের জন্য সুবিধামত কাজের সুব্যবস্থা করিয়া লইতে অভিলাষী হইলেন।

(ক্রমশঃ)

জন্তু পরিচয়

জন্তু ও উদ্ভিদ।

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

সৃষ্টির আদিতে মাতা বসুন্ধরা ছিলেন জীব-শূন্যা। তখন পৃথিবী এমন শস্য শ্যামলা ছিল না —তাতে জীবজন্তুও কিছুই ছিল না। মানুষ ত ছিলই না। মানুষের বহু পূর্ব্বে আবির্ভাব হয়ে ছিল জন্তুর ও উদ্ভিদের। জন্তুরও বহু পূর্ব্বে জন্ম হয়েছিল উদ্ভিদের। এই পৃথিবীতে উদ্ভিদই আমাদের পরিচিত অতি আদি জীব।

আমাদের পরিচিত আদি জীব হলেও উদ্ভিদই পৃথিবীর আদি জীব নয়। পৃথিবীতে অতি আদিতে যে-জীবের জন্ম হয়েছিল সে-জীব আজ আর নেই, তার চিহ্নও আজ পৃথিবী হতে লোপ পেয়ে গেছে। লোপ পেয়ে গেলেও অনুমানের উপর নির্ভর করে বলা যেতে পারে সেই অপরিচিত অতি আদি জীব না-জন্তু না-উদ্ভিদ। খুব সম্ভবতঃ জন্তুর যা ধর্ম্ম তাও তাতে ছিল না, উদ্ভিদের যা ধর্ম্ম তাও তাতে ছিল না। সেই আদি জীব দেখতে ছিল এক কণা জেলির মত। এত ছোট ছিল যে খালি চোখে তাকে দেখা যেতো না। কিন্তু সেই কণা পরিমাণ পদার্থের ভিতরে ছিল একটুকু প্রাণ। প্রাণ থাকলেই খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়। সেই আদি জীব-কণাটুকু তখন বেঁচেছিল পৃথিবীর জল হাওয়া হতে খাদ্য গ্রহণ করে। জলের মধ্যেও তখনো ছিল নুন জাতীয় পদার্থ, আর হাওয়ার মধ্যে ছিল নানা জাতীয় বাষ্পীয় উপকরণ। এই দু' জাতীয় উপকরণই জীবের প্রাণ ধারণের জন্য একান্ত আবশ্যক।

প্রাকৃতিক নিয়মে সেই আদি জীব-কণা কাল-ক্রমে বিভক্ত হল দু'টি শাখায়, এক গাছের দুটি ডালের মত। সেই শাখারই একটি আজ উদ্ভিদ অন্যটি জন্তু।

সেই আদি জীব-কণাটুকু অতি আদিতে কি রূপে প্রথমে দু'টি জীব-শাখায় পরিণত হয়েছিল তা আজ আর জানবার উপায় নেই। কেননা সে যুগের পৃথিবীর যে চেহারা, তার জলবায়ু, তার প্রাকৃতিক অবস্থা সবই ছিল আজকের পৃথিবী হতে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। তখনকার পৃথিবীর জল বায়ু ছিল উত্তপ্ত, তাতে ঝড়, বৃষ্টি, ভূকম্পণ অগ্ন্যুদ্গার প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ছিল অতি প্রচণ্ড। প্রাকৃতিক সেই বিপর্য্যয়ের যুগে, জল হাওয়ার ভিন্ন ভিন্ন উপকরণের মধ্যে, রাসায়ণিক ক্রিয়ার কী যোগ বিয়োগ ঘটেছিল আজ আর তা জানবার উপায় নেই। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত রূপে ধরে নেওয়া যেতে পারে আদি জীব-কণার যে শাখা প্রথম উদ্ভিদ-দেহে পরিণত হয়েছিল সে-শাখা যেরূপেই হোক তার দেহে উদ্ভিদ দেহের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ সবুজ পদার্থ জন্মাতে সমর্থ হয়েছিল। উদ্ভিদ দেহের এই সবুজ পদার্থটি অতি একটি আশ্চর্য্য জিনিস। এই সবুজ পদার্থটি দিয়ে উদ্ভিদ শুধু হাওয়া, জল ও সূর্য্যের কিরণ দিয়েই সে তার নিজের দেহের প্রধান পুষ্টি চিনি জাতীয় পদার্থ তৈরী ক'রে নিতে পারে। অতি আদিতে পৃথিবীতে ছিল শুধু জল, হাওয়া ও সূর্য্যের কিরণ। সুতরাং তখনকার যুগে পৃথিবীতে একমাত্র উদ্ভিদেরই বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল। হাওয়ার উপকরণ হতে, সূর্য্য কিরণের সাহায্যে, নিজ দেহের সবুজ পদার্থ দিয়ে উদ্ভিদ নিজের

পুষ্টির জন্য যে চিনি জাতীয় পদার্থ জন্মায়, সেই সঞ্চিত চিনি পদার্থ উদ্ভিদ দেহ হতে খাদ্যরূপে গ্রহণ করেই জন্তু বেঁচে থাকে। এই চিনি জাতীয় পদার্থ জীব পুষ্টির একটি প্রধান উপকরণ। উদ্ভিদ ভিন্ন হাওয়ার উপকরণ হতে এই চিনি জাতীয় পদার্থ তৈরী করবার ক্ষমতা অন্য কোন জীবের নেই। তাই জন্তুর প্রাণ ধারণের জন্য উদ্ভিদ দেহের একান্ত প্রয়োজন।

অতি আদি জীব-কণা হতে যখন প্রথম উদ্ভিদ দেহের জন্ম হয়েছিল (কিরূপে, সে ইতিহাস অজ্ঞাত) তখন পৃথিবীতে মাটি ছিল না। তখন সমুদ্র ছিল পৃথিবী জুড়ে। তখন সেই সমুদ্রের জলে উদ্ভিদ দেহ ছিল ভেসে। তারও আকার ছিল কণা পরিমাণ। কিন্তু তখন সে তার দেহে সবুজ পদার্থ জন্মাতে সমর্থ হয়েছিল। সুতরাং তখন তার আর রসদের ভাবনা ছিল না। জলে ছিল তখন প্রচুর নুন জাতীয় পদার্থ, আর হাওয়ায় তো অঙ্গার বাষ্পের অভাবই ছিল না। হাওয়ার অঙ্গার ও জলের নুনকে সে সূর্য্য কিরণের সাহায্যে গায়ের সবুজ পদার্থ দিয়ে তৈরী করতো চিনি জাতীয় পদার্থে। তাই ছিল তার খাদ্য। এখনো সমুদ্রে এরূপ কণা জাতীয় উদ্ভিদ অনেক দেখতে পাওয়া যায়। এদের সাধারণ নাম শেওলা। আমাদের পুকুরের জলেও নানা জাতীয় শেওলা দেখতে পাওয়া যায়। এরাও এক শ্রেণীর উদ্ভিদ, অতি আদি যুগের উদ্ভিদ।

এ হলো এক শাখার ইতিহাস! অন্য শাখা যে কারণেই হোক নিজের দেহে সবুজ পদার্থ জন্মাতে পারল না। এ জন্য খুব সম্ভব তার পারিপার্শিক অবস্থাই দায়ী ছিল। যে কারণেই হোক নিজের দেহে সবুজ পদার্থ জন্মাতে না পারায় জীবন ধারণের জন্য সে ধরল অন্য পথ। জীবন ধারণের জন্য তার প্রধান প্রয়োজন ছিল চিনি জাতীয় পদার্থের। সে পদার্থ তার তৈরী করবার শক্তি ছিল না—কিন্তু উদ্ভিদ দেহে সে পদার্থ ছিল প্রচুর পরিমাণে। জীবন ধারণের জন্য সে শিখল উদ্ভিদ কণা খেতে। এ শিক্ষা তার এক দিনে ঘটেনি। উদ্ভিদ দেহ জন্মাবার বহু পরে সে এ বিদ্যা আয়ত্ত করতে পেরেছিল। জন্তু মাত্রই বেঁচে থাকে উদ্ভিদ-দেহে সঞ্চিত তৈরী খাদ্য খেয়ে। বাঘ সিংহ খায় বনের হরিণ, খরগোষ, শূয়র প্রভৃতি জন্তু। হরিণ ও খরগোষ প্রভৃতি জন্তু কী খায়? ওরা সকলেই তৃণভোজী। কাজেই হরিণ, খরগোষ প্রভৃতি জন্তুর মধ্যেও বাঘ সিংহ পায় উদ্ভিদ দেহে তৈরী সঞ্চিত খাদ্য চিনি জাতীয় পদার্থ।

পৃথিবীতে যে জন্তু প্রথম জন্মেছিল সেও ছিল আদি উদ্ভিদেরই মত জলের জীব জলের মধ্যে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল খাদ্য খাদকের। যে খাদ্য, সে চিরদিনের মত উদ্ভিদই রয়ে গেল কিন্তু কালে কালে তার পরিবর্ত্তন ঘটল অনেক। আর যে খাদক, সেই আজ জন্তু।

উদ্ভিদ ও জন্তুর মধ্যে প্রধান পার্থক্য তাদের রসদ নিয়ে। উদ্ভিদ তার পাতার সবুজ পদার্থ দিয়ে হাওয়ার উপকরণ হতে নিজের খাদ্য নিজেই তৈরী করে। সেই তৈরী খাদ্য খেয়েই বেঁচে থাকে জন্তু। উদ্ভিদ ভিন্ন জন্তু বাঁচতে পারে না।

বিচিত্র সংবাদ

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ সর্ব্ব প্রথম মেজেতে কার্পেট ব্যবহার করেন কিন্তু ১২৫৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনের এক বিশপ ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম মেজেতে কার্পেট দিয়ে ঢেকে রাখতেন।

—০—

একজন প্রফেসার আবিষ্কার করেছেন যে পৃথিবী ২০০০ হাজার বছর আগে যেমন তাড়াতাড়ি ঘুরতো এখন ততটা জোরে চলে না। তিনি বলেছেন যে ১,৬০০,০০০,০০০ বছর পরে হয়ত পৃথিবী একেবারে থেমে যাবে।

—০—

দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিলে এক রকম গাছ দেখা যায় তাকে আলো-গাছ বলে। রাত্রিকালে এই গাছ হতে এক রকম উজ্জ্বল আলো বার হয়, সেই আলোতে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বইয়ের ছোট অক্ষরও সহজে পড়া যায়। প্রায় আধ মাইল দূর থেকে এই আলো বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

পুষ্টিকর খাদ্য

বাড়ন্ত ছেলে মেয়েদের শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে হলে কি কি খাদ্য সারা দিনে দরকার তার সংক্ষিপ্ত তালিকা :—

১। কোন কাঁচা সব্জি।
২। আলু ছাড়াও অন্যান্য সিদ্ধ সব্জি।
৩। ডিম, মাছ বা মাংস।
৪। লেবু বা টোমাটো।
৫। রান্না করা ফল।
৬। আটার রুটি।
৭। ভিটামিন ডি—কড লিভার ওয়েল।
৮। ফল।
৯। দুধ।

উত্তর

বলত ?

১। ড্রামাস্কাস।
২। টার্কির পুরাতন সহর পেট্রা।

ধাঁধা

১। (ক) কোন্ লোকরা বেশীদিন বাঁচে না আর বয়স খুব বৃদ্ধির অনুপাতে তাদের বড় জামা বা কাপড় দরকার হয় না ?

(খ) যারা আমায় গ্রহণ করে তারা উন্নতি করে, যারা আমায় পেয়েছে, তাদের দিন সুখে যায় না, মূর্খ এবং জ্ঞানী সকলেই আমায় ঘৃণা করে, তথাপি আমাকে ছাড়া কেহ উচ্চ পদে উঠতে পারে না। বলত আমি কে ?

পৌষ মাসের ধাঁধার উত্তর—সমর।

মাঘ মাসের ধাঁধার উত্তর—

বোর্ণিও, মালয়, ফিলিপাইন, বর্ম্মা ও চীন।

নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাগণ পৌষ মাসের ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন—

অমলকুমার মিত্র, গৌহাটি। রঞ্জন দাস, গোরখপুর।

মাঘ মাসের ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন—

অঞ্জলী মুখার্জ্জি, ধুবড়ী। অমলকুমার মিত্র, গৌহাটি।

প্রতিযোগীতার পুরস্কার পাইয়া কুমারী পুষ্পাঞ্জলী দেবী লিখিয়াছেন—

১। আপনার প্রেরিত দুইখানা সুন্দর বই পুরস্কার পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। বই দু'খানা আমাদের এত মনোমত হইবে ইহা পূর্ব্বে আশাই করি নাই। আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন।

। কুমারী অঞ্জলী মুখার্জ্জির মাতা ঠাকুরাণী জানাইয়াছেন,—অঞ্জলী প্রতিযোগীতা পুরস্কার প্রাপ্ত বই পাইয়া খুসী হইয়াছে।

———

মুকুল প্রেস—২৯৪, দর্গা রোড, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত কালা চাঁদ দের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা গেঞ্জী

সকলের এত প্রিয় কেন?

একবার ব্যবহারে বুঝিতে পারিবেন।

সামার-লিলি
নটেড্ মেস
ফ্যান্সি-নীট
সুপার-ফাইন
কালার-সার্ট
লেডী-ভেষ্ট
কুল্‌টী

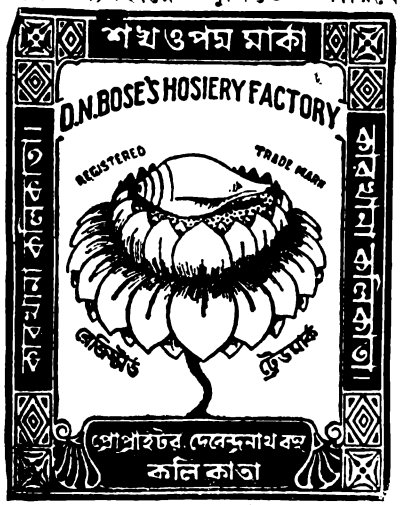

সামার-ব্রীজ
শো-ওয়েল
কুল-ওয়্যার
সামার-নীট
গ্রে-সার্ট
সিল্‌কট
স্যাণ্ডো

সুদীর্ঘকাল ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট—আপনিও সন্তুষ্ট হইবেন।

কারখানা—৩৬।১এ, সরকার লেন, কলিকাতা। ফোন—বড়বাজার ৬০৫৬

সিপ্রা

জান্তব চর্বি বিবর্জিত সাবান

কোমল অঙ্গের

বিশেষ উপযোগী

প্রচুর ফেন ঃঃ স্নেহময় স্পর্শ
মনোরম গন্ধ

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা .. বোম্বাই

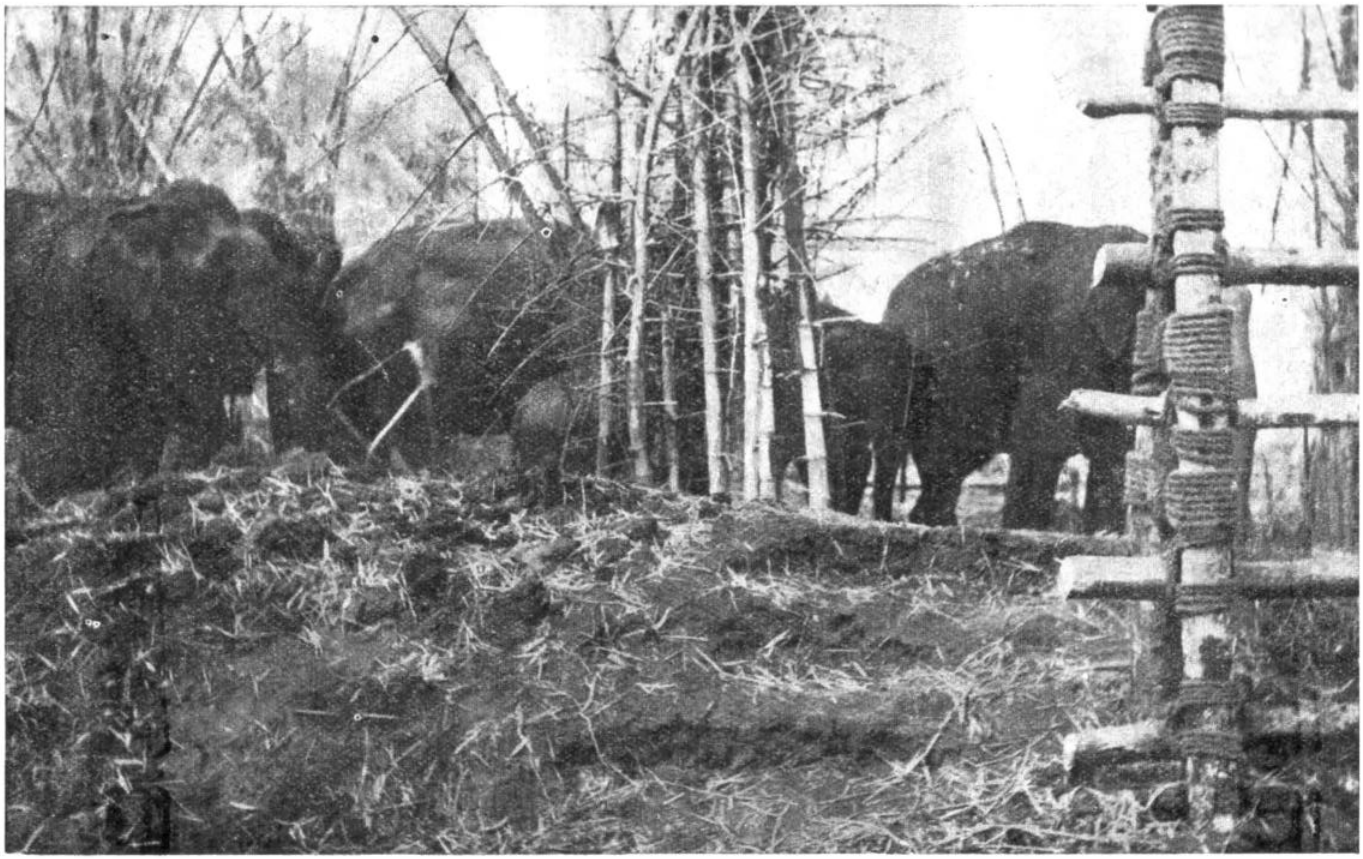

বুনো হাতীর দল